"পটলডাঙার পাঁচালী" নামের মধ্যেই বর্তমান সংকলনের পরিচয় বিধৃত। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে গল্প মনীশ ঘটক কমই লিখেছিলেন। "বিষাণ" পত্রিকায় প্রকাশিত বৈঠকী গল্প ও বিভিন্ন সময়ে অনূদিত গল্পগুলি এ সংকলনে সন্নিবেশিত হয়নি। আর সব গল্পই সংকলিত হল। এমন একটি সংকলনই লেখকের অভিপ্রেত ছিল।

মহাশ্বেতা দেবী

॥ গোষ্পদ ॥

রবিবারের অলস দুপুর। চারিদিক নির্জীব, ক্লান্ত। গাছের ডালে কাকটা অনেকক্ষণ পর-পর অবসন্নভাবে মাঝে-মাঝে ডাকছে।

চারিদিকের এই শ্রান্ত-শান্তির মধ্যে আলস্য নেই, ওই ভিখিরির দলের। দল বেঁধে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, তারা দোরে দোরে ঘুরছে। রবিবারেই তাদের যা কিছু রোজগার। দলের প্রায় সবাই মেয়ে।

আর ক্লান্তি ছিল না তার, যে ওই ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ধ্বংসপথের যাত্রীদের মাথার ওপরে আগুন ঢালছিল! খাঁ-খাঁ রোদে পথঘাট তেতে উঠেছে, হাওয়ায় গা ঝলসে যাচ্ছে—মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড়!

কিন্তু ভিখিরির আবার রোদ-বিষ্টি! পেট চালাতে হবে ত?

সম্প্রতি রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা হচ্ছে পটলডাঙার দল। দলের মধ্যে সব গোনা-গুন্‌তি। বাইরের কেউ যে ফাঁকি দিয়ে এসে দলে ঢুকে তাদের সাথে রোজগার ক'রে যাবে, তার যো'টি নেই। মোড়ল খেঁদি-পিসির এমনি কড়া নজর! এই তো সেদিন হাটখোলার কুসুম এসে ভিড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হ'ল? খেঁদি তো বেটিকে খুন করতে বাকি রেখেছিল!

দলের সবাই তাকে ভয় করতও যেমনি, নামও তেমনি আশে পাশের পাঁচখানা পাড়ার সব দলই জানত।

এ-হেন ডাকসাইটে খেঁদির দল চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে। সামনেই একটা বড় বাড়ি দেখে সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। কাচ্চা-বাচ্চা কতকগুলো চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছিল, চ্যাঁ-ভ্যাঁ ক'রে কাতরে উঠল। বড়দের মধ্যে এই সূত্রে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল।

কিন্তু আসল ব্যাপার অর্থাৎ ভিক্ষে পাওয়াটা তখনো বাকি, তাই লড়াই বেশিদূর গড়াল না।

—হরেঃ কেস্‌টো,—দুটি ভিক্ষে পাই বাঁবা!

—এই-য়ো—ঠার্ যাও, উধার্—মৎ আও—মাৎ আও—দরওয়ানজীর হুমকিতে আর কেউ বেশি দূর না এগিয়ে ওইখানেই থেমে গেল। তারপর আঁচল, কোঁচড়, থলে, যার যা ছিল, সবাই তাই পেতে, সিকি-মুঠো ক'রে চাল নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

বাইরে এসেই খেঁদি দাঁড়াল। এটা দলের নিয়ম। প্রত্যেক জায়গা থেকে বেরোন মাত্রই সবাইকে একবার গুন্‌তি ক'রে নিতে হয়। আর সবাই যে যার মতো বক্‌বক্ করতে করতে, অথবা ছেলে পিটতে পিটতে এগুলো। হঠাৎ খেঁদি চেঁচিয়ে উঠল,—এই মাগী, তু' কে লা?

যাকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হ'ল, সে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চলেছিল। কেউ তাকে আগে লক্ষ্য করেনি। তার কাপড়খানা অন্য সবার মতো অত জীর্ণ নয়, একটু ফরসাই! চলনটাও বাধো-বাধো।

খেঁদি তার হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল। দলের দিকে ফিরে বলল, যা, যা তোরা এগো! তারপর মেয়েটির কাছে এসে বলল, তু'মাগী কোত্থেকে এয়েচিস? খেঁদি মোড়লনীর নাম শুনিস্ নি? দেখি দেখি মু'খানা তোর—ব'লে, একটানে তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়েই অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

—ওমা,—এযে ভদ্দর ঘরের মেয়ে গো!

খানিকক্ষণ তার মুখে কথাই ফুটল না। মেয়েটি ততক্ষণে নিজের মুখের কাপড় আবার টেনে দিয়েছিল। খেঁদি দলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, ক্ষ্যান্ত আজ তুই খবরদারি করিস্। আমি ফিরনু।

মেয়েটিকে নিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

দলের সবাই একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ফেরবার উপায় নেই, তাহলে পিসি কি আর আস্ত রাখবে? তাছাড়া পেটের তাড়া!

গলির পর গলি, সরু, মোটা, আবছা, অন্ধকার নানা রকম রাস্তা পার হয়ে আস্তানায় পৌঁছে খেঁদি বলল, এইবার বলতো বাছা, কোত্থেকে এয়োচো?

সার সার মাটি-লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম্ ফেলবার উপায়টুকুও বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই—সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া।

মেয়েটি দু'একবার চারদিকে তাকিয়ে ঘোমটার মধ্যেই শিউরে উঠল। তারপর, মাগো—ব'লে, সেখানেই বসে পড়ল।

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বলল,—কি গেরো! বলি ভিরমি গেল নাকি! কিগো ভালমানুষের মেয়ে, বলি দু'কদম হাঁটতে পারবে? চল, চল, আমার ঘরে, সেখানে গে সব বলবে চল।

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে, দিনের রোজগার চাল ক'টি ও গোটা দু'য়েক পয়সা সযত্নে এককোণে রেখে, খেঁদি এসে মেয়েটির সামনে বসল। বলল, এইবার মুখের কাপড় খোল। ওকি, কাঁদচ? তুমি নতুন নোক বুঝি? আর তাতো বটেই, সে তো তোমার চেহারাতেই নেকা রয়েচে! তা, এমন ছুরত্ থাকতে ব্যবসা না ক'রে পথে বেরিয়েচ যে বড়? ব্যারাম পীড়ে হয়েচে বুঝি!

মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

খেঁদি মহা বিব্রত হয়ে বলল,—ভ্যালা ঠ্যাকারের মধ্যে পড়নু যে। এযে রা-বাক্যি কিছুই নেই, যা বলি তাতেই কাঁদে। বলি বাছা, সব খুলে না বললে কি ক'রে বুঝব? আর, তা না হ'লে ঠাঁইও তো পাবে না এখানে! বাইরের মান্ষের হেথা থাকবার নিয়ম নেই। তুমি যদি দলে ভর্তি হও, তবে অবিশ্যি থাকতে পাবে। ঘর নিজেই গড়ে

নাও, চাই আর কারো সাথে বকরা ক'রে থাকো, সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু আগে সব শোনা দরকার তো?

মেয়েটি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে, নাকের জল চোখের জলে এক হয়ে যা বলল, তার মর্ম:

সে পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত ঘরের বউ। সাধারণত যা হয়ে থাকে, তেমনি এক পুরুষের সাথে কলকাতায় কালীঘাট দেখতে আসে। তার সাথী তাকে নিয়ে এসে মানিকতলা খালের কাছে এক বাড়িতে রাখে। একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে তাকে নিয়ে, নেবুতলার এক বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে। গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি যা ছিল, সব সে নিয়ে গেছে। গলার একটা মালা ছিল, তা সেই নেবুতলার বাড়িউলি কেড়ে রেখেছে। তার সাথী চলে যাবার পর প্রথমটা সে কিছুই বোঝেনি। বাড়িউলি তাকে নানারকম আশ্বাস দিয়েছিল। দিন দুই থাকবার পর, একদিন রাত গোটা এগারোর সময় তার ঘরে দু'জন মাতাল ঢোকে। সে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন সকাল হয়েছে—তারা ফিরে গেছে।

বাড়িউলি এসে বলল,—কি বাছা, খবর ভাল তো?

তার কথা কইবার শক্তি ছিল না। বাড়িউলি আগের দিনই তার হারটা দখল করেছিল, কাজেই জবাব না পেয়ে বিশেষ মেজাজ খারাপ করল না। বরং বলল,—তা ঘুমোও বাছা! পেথমদিন; একটু কাহিল তো লাগবেই!

বেলা গোটা দশেকের সময় মনের ও শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কোন্ পথ তার খোলা আছে? সে কয়বাড়ি আশ্রয়ের চেষ্টা করল। সবাই কেমন ক'রে যেন তাকায়, সব শুনে ফিরিয়ে দেয়। সব পথ বন্ধ। ভিক্ষেই করতে হবে! কিন্তু একা-একা নতুন মানুষ, ভেবে কূল পাচ্ছিল না, তাই পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাড়ি থেকে পটলডাঙার দল বার হ'তেই তাদের

সাথে গিয়ে জুটেছিল। ভেবেছিল, এতবড় ভিখিরির দলে মিশে থাকলে কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না।

খেঁদি বলল, তা—তোমার গে, বাছা, আমাদের দলে যাদের দেখলে, সবাই তো ওই করতো এককালে! পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে পড়ে, পতে বেরিয়েচে। তোমার এই বয়েস, অমন চেহারা—তা বাপু নিজে বোঝ।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিট্‌খিট্‌ ক'রে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি ভাবল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা, থাকো! কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কোলকাতা হেন জাগায় কি সামলে থাকতে পারবে? আমার খবরদারিতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সব সময় তো আমিও চোক রাখতে পারবো না।

মেয়েটি আবার চোখে আঁচল দিতেই খেঁদি বলে উঠল,—আচ্ছা, আচ্ছা। ভয় নেই; কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। আমি একা থাকি, এইখেনেই দু'জনে থাক্‌ব'খন।

মেয়েটি পটলডাঙার দলে ভর্তি হয়ে গেল।

॥ পটলডাঙার পাঁচালী ॥

খেঁদি-পিসির পটলডাঙার আস্তানা। মোড়লনী ছাড়া আর সবাই এক ঘরের বাসিন্দা।

পটলডাঙার ভিখিরি-পাড়া। প্যাচপেচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার সার, গায়ে লাগান।

রাতদুপুর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে এমনি একটা হোগলার কুঁড়ের অন্দর। এক কোণে দেয়ালের গায়ে বছর দুয়ের পুরোনো একটা ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারের ছবি গোঁজা। দেয়ালে এখানে সেখানে দড়ি টাঙানো, তাতে ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি, এই সব। জানালা একটিও নেই, দোরে ঝাঁপ টানা। দোর-গোড়ায় একটা কেরোসিনের ডিবে থেকে মিটমিটে আলো ও অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্চে। ধোঁয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ও নোংরা আঁস্তাকুড়ের গন্ধ; ঘরের পেছনে দিন দুই হল একটা কুকুর মরে পচে আছে, তার গন্ধ—আর কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের গন্ধ একসাথে ঘরটাকে ভরে রেখেছে।

স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেয়া কাঁথা,—যার যেমন জুটেচে, পেতে, ফকরে ও সদি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার সার পড়ে আছে। ধনুকের মতো বেঁকে দেয়ালের ধারে নুলো হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তারই পাশে কুঠে বুড়ি। ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে উসখুস করছে। তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি। সেটা সদির গের্দ। তার এ-ধারে কানা-গুবরে কানা-চোখটা মেলে নাক ডাকাচ্ছে। মাঝে বাকি জায়গাটুকু খালি। এধারের বেড়ার গায়ে খালি ভুঁয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নফর, কি একটা কুৎসিত রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।

ঝাঁপ ঠেলে সদি ঘরে ঢুকল। তার বাঁদিকের গালের মাংস নেই

—ছ'পাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঢিবি কপালের ওপর উষ্কখুষ্ক চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা। পরনের ছেঁড়া কানিটা একধারে অনেকটা উঠে গেছে, আর একধারে হাঁটু পর্যন্ত নাবানো। গায়ের শতচ্ছিন্ন আঁচলটা না থাকারই মতো।

তার মুখে কোন ভাবের ছাপ পড়ে না, কিন্তু চোখের কোলে তখনো জলের ছাপ শুকোয় নি।

ঝাঁপ ঠেলার শব্দে কুঠে বুড়ি চোখ মেলল।

কুঠে। মর্ মর্! —মাগো?

নুলোটা পাশ ফিরল। একটা ধনুক যেন বাঁ-কাত থেকে ডান কাতে ঘুরে এল।

কুঠে। উহুঃ!···উঃ উঃ···

নুলো। (গলা তুলে) লাগল?

কুঠে। (যে হাতটা তখনও খসে পড়েনি, সেইটে দিয়ে নুলোর মুখে এক থাবড়া কসে)···মর···মর! যমও তোকে ভুলে আচে···

সদি। আহা বকিস কেনে? ওকি আর জেনে গুঁতো দিয়েচে তোকে?

কুঠে। রুপুসি! কেলি শেষ করে দুপুর রাতে কোঁদল করতে এলেন। বলি, রূপ দেকে ক'জনার মন মজল লো, ক'জনার টঁ্যাকে হাত বুলোলি?

সদি। মর মাগি! ভালো কতা বলনু তো খেঁকিয়ে এল দ্যাক!

মার খেয়ে নুলো বুড়িকে আঘাত করার জন্যে হাত ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু আঘাত যথাস্থানে পৌঁছোতে হলে যে রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক, তা তার ছিল না,—তাই তার আকুলি বিকুলিতে বিকৃত অঙ্গগুলো শুধু তিড়িক-তিড়িক করে লাফাতে লাগল।

নফর। (গোলমালের শব্দে কাৎরে উঠল) উঃ······

সদি। আহা, তু' অমন খালি ভুঁয়ে পড়ে গড়াচ্চিস ক্যানে রে! কাঁতা কোতা?

নফর। (যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে)—হোতা!

সদি দড়ির ওপর থেকে কাঁথা নামিয়ে এনে, পেতে, নফরকে তার ওপর শুইয়ে দিয়ে, নিজে পাশে বসল।

নফর। সদি, তু' এত রাত জেগে যে?

সদি। বাইরে গেছনু।

নফর। একন?

সদি। হ্যাঁ।

নফর। ক্যানে?

সদি। পিসির তাড়ায়!·····কাল থেকে দস্তুরী দিতে পারিনি, বললে, খেতে দোব না!

নফর। হুঁ।··আজ খাস্‌নি তামাম্ দিন?

সদি। না।

নফর। তা, ঘুরে এলি, হোলো কিছু?

সদি। ছাই! ওরা আবার কবে কাকে পয়সা দ্যায়!·· আরো হুমকি দিলে যে, থানায় নে যাবে! (কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল)।

নফর। কারা? কে হুমকি দিলে রে?

সদি ফোঁপাচ্ছিল, জবাব দিল না।

নফর। ভিখ্ মাঙতে যাসনি? তবে কোতা গেছ্‌লি?

সদি। তাই ত' গেছনু! পতে···এক ব্যাটা কনেস্টবল—

নফর। কনেস্টবল!

সদি। হ্যাঁ। ঝিমুচ্ছিল। আমায় দেকে বললে, পয়সা দেবে। সারাদিন দানা নেই পেটে, আমার কোনো সাড় ছিল না। পয়সা দেবে শুনে···

কুঁঠে। (খিলখিল ক'রে হেসে) কত দিলে লা? মরি মরি··· যে রূপ···বলি, দিলে কত?

সদি। (বুড়ির কথায় কান না দিয়ে নফরকে) তোর আজ খুব

কষ্ট হচ্চে, না? কাৎরাচ্চিলি যে!···সেই যে মলম নে এইছিলি কাল লাগাস নি?

নফর। কি ক'রে লাগাব,···উঠিই নি ত' সারাদিন!

সদি। কোতা আচে? দে,···আমি নাগিয়ে দি···

মলম এনে সযত্নে নফরের ঘায়ে দিয়ে দিতে লাগল।

নফর। (একটু আশ্চর্য হয়ে, আপন মনে) তু'···তুই খাসনি সারাদিন,—না!···হুঁ!

সদি। আরাম লাগচে একটু?

নফর। খুব।···সদি···

সদি। কি?

নফর। তু' আমদানির, না হেতাকার রে?

সদি। হেতাকার।

নফর। আমি আমদানির। বাঁকড়ো জেলায় ছেল' আদৎ বাড়ি। সে বছর মড়কে সব গেল,—বাড়িঘর—গরুবাছুর—মা-বাপ—সব। কতইবা বয়েস তকন,—এই বছর ছ'-সাত হবে। পাড়ার কেষ্টধনের সাতে চলে এনু কোলকাতা গতর খাটিয়ে খাব বলে!—তা-পর···

সদি হাঁটুতে মাথা রেখে শুনছিল। হঠাৎ গুবরের মেলা-চোখটার ওপর নজর পড়তেই আঁতকে উঠল।

সদি। মাগো!···

নফর। কি রে?

সদি। না, কিচ্ছু না। ওই গুবরেটা! প্যাটপ্যাট ক'রে চেয়ে ঘুমুচ্চে!

নফর। ওটা কানা চোকটা রে,—চেয়ে নেই।

সদি। আচ্চা! তা'পর—

নফর। বলি। কোলকাতা এসেই দলে ভিড়ে গেনু। পকেট-মারায় হাতে-খড়ি দিয়ে ধীরে-সুস্থে ভারি কাজেরও মহড়া দিতে শুরু

কন্নু। বছর খানেকের মধ্যে বারচারেক ফাটক থেকে ঘুরে এনু!—চোককান ফুটল···

সদি। হেতা জুটলি কি ক'রে?

নফর। জানের দায়ে। আগের দলে পুলিশের নজর পড়ল কড়া, ট্যাঁকা গেল না!

খানিক দু'জনেই চুপ ক'রে রইল। কুঠে বুড়ির আবার ঝিমুনি এসেছিল! একটা আরশুলা নফরের পায়ের ঘায়ে মুখ দিচ্ছিল, সদি তাড়িয়ে দিয়ে কাঁথাটা পায়ের ওপর টেনে দিল।

নফর। সদি!

সদি। ঘুমুস নি?

নফর। না।···জনম ইস্তক্ দলে থেকেও তোর দলছাড়া রীত ক্যান রে?

সদি। (অবাক হ'য়ে) কি?

নফর। তু' ত' আর সবার মতো নোস? আর কেউ আমায় একটা আহা-ও বলেনি এ্যাদ্দিন!···

সদি জবাব দিল না। হতভম্ব হয়ে বোকার মতো নফরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

নফর। একটু আবছা-আবছা আমার একজনের কতা মনে হয়। খুব ছোটবেলা,···আমার বাপ যকন আমায় ধরে পিটত,···সে তকন আমায় নিয়ে ষাট-ষাট করত,···খেতে দিত!

সদি। কে?

নফর। বেশি মনে নেই। এক একবার মনে হয়। বোধ হয় আমার মা।

আবার দু'জনে চুপ করল। নফর একমনে ক্যালেণ্ডারের ছেঁড়া ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। অবসাদে ও ক্লান্তিতে সদির দু'চোখ ভেঙে আসছিল।

ঝাঁপ ঠেলে একজন চুরচুরে মাতাল, বয়স বছর তিরিশ বত্রিশ হবে,

ঘরে ঢুকল। বীভৎস, কদাকার মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অন্ধকার। দু'কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। সরু সরু কাঠি কাঠি হাত পা, ঠকঠক ক'রে কাঁপচে। চোখ টকটকে লাল। একহাতে একটা ভাঙা মাটির ভাঁড়, বগলে কতকগুলো ছেঁড়া এঁটো কলাপাতা।

সে ফকরে।

সমস্ত ঘরটা তাড়ির বিকট গন্ধে ভরে উঠল।

ফকরে। মাইরি নপা !···পেল্লায় ভোজ—

নফর। কোতা রে ?

ফকরে। (এগিয়ে এসে, অঙ্গভঙ্গী করে) বলে কে মাইরি ?··· সদি !···বহুৎ আচ্ছা !···কি সোনাচ্চাঁদ···হবে নাকি এক পাত্তর···

নফর। ভোজ মেরে এলি কোতা বল না !

ফকরে। ধুত্তোর ভোজ ! শ্···আলারা ! এই কলাপাতায় মুড়ে কি দিলে মাইরি চাট্টি,···বগলদাবা করে সরে পড়নু !—হেতা এসে দেকি কি না,···ভোজ, না শালার ভোজবাজি ! খালি এঁটো পাত !··· মাইরি খালি···একদম্···

নফর। সদি,···যা, শুগে' যা।

ফকরে। মাইরি আর কি,···আমরা ভেসে এইচি ! (ভাঁড়টা রেখে) নে, ধর।···অমন দশবিশ ভাঁড় উড়েচে আজ ডিপোয়··· এটাও কাবার হোত পতে,—শুধু তোদের মুক চেয়ে···

নফর। খুব করিচিস। সদি যা।

সদি। (নফরের কথায় কান না দিয়ে) বগলে কি রে ?

ফকরে। (পাতাগুলো সদির গায়ে ছুড়ে দিয়ে) ভোজ !—খা, খা—(হেসে উঠল) ! পাতায় ভাত-তরকারি লেগেছিল। দেখতে পেয়ে সদি আগ্রহে চাটতে লাগল।

ফকরে। মেরে দিলি ?—জবর হাবাতে হইচিস মাইরি !

নফর। ঘুমো গে' ফকরে—দিক করিস্‌নি।

ফকরে। সে কি রে !···এক পাত্তর···

নক্কর। না—না! বেতর ঠেকচে বড়।

ফকরে। সদি!

ভাঁড় ধরে এক চুমুকে সবটা তাড়ি নিঃশেষ ক'রে সদি উঠে দাঁড়াল।

ফকরে। কোতা চললি?

সদি। যেকানেই যাই, তোর কি!···গুয়ো কোতাকার!

ফকরে। মাগী না ধিঙ্গি!—আমার খেয়ে আমারই চোখ রাঙাবি?

সদি। একশবার। গেঁজেল ভূত কোতাকার! মর—মর!

সদির হাবভাব দেখে নফর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

সদি। আ মর মিন্‌সে! চোক মাচ্চিস যে?—হুঁ হুঁ বাপধন,—ওতে হয় না!—পয়সা আছে?—নগদ? ফ্যাল আগে—তা'পর!—ফ্যাল' কড়ি মাখ তেল··

ফকরে। মোক্ষম বলচিস মাইরি! হিঃ হিঃ হিঃ। ফ্যালো কড়ি,—হোঃ হোঃ!

সদি। খিকখিক রাক।—আর আচে···নেই—মড়া,—কিপটের ডিম কোতাকার!

ফকরে। মুক সামলে কতা কোস্ সদি!—কিপটে! ফকিচ্চাঁদ কিপটে!—তবে কাপতেন কে বাপ? মামার হোতা আজকের মাইফেল চালালে কে শুনি?—কুসমি, রতনা, হেবো,—ছাক গে যা, এক একটা পেট ফুলে ঢাক হয়ে পড়ে আচে! দিনের রোজগার বিলকুল সাফ হয়ে গেল, এক সন্ধ্যেয়—কিপটে! কোন্ শালা বলে কিপটে।

সদি। নে' নে'—ডমফাই রাক! হেবো কুসমির পেট ফুলল, তাতে মোদের কি এল গ্যাল রে? ঠোঁটও ত' ছাই ভিজল না!—এই নপা!—এই শুয়োর?—ঘুমুচ্চে ছ্যাক্!

ফকরে। আচ্চা—রোস তুই! নে আসচি আমি দু'চার ভাঁড়। ঘুমুসনি—

সদি।—আমিও যাব—চল্।

নফর। কোতা যাবি তুই এই রেতে।

সদি। যমের দোরে। যেতা খুশি। হেতা থাকলে খেতে দিবি তুই?

ফকরে। চ' চ'—বক্‌বক্ করিস পিছে—

সদি ও ফকরে বেরিয়ে গেল। নফর একটু উঃ আঃ করে পাশ ফিরে শুল!

নফর।···সদি—শোন!···চলে গেচে।

কুঠে বুড়ির ঘুম আবার ছুটে গেছিল। সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

কুঠে। গন্ধ পেলুম যেন! এই মড়া, বলি আচে কিচু?

নফর। কাকে বলচিস? আমাকে?

কুঠে। তা না ত' কি ওই মুলোটাকে? সঙ! বলি, সুবাস পেনু যেন। আচে দু'এক ফোঁটা?

নফর। ফকরে এনেছ্‌ল। সদি মেরে দিয়েচে সবটা।

কুঠে। সবটা? মর মর! কি শত্তুরই জুটেচে···

নফর। কি করেচে ও তোর? তো মাগীর সব তাতেই রাগ!

কুঠে। আহ—হা! মরে যাই!—দরদ দেখিয়েচে কিনা! মলম নেপে দিয়েচে, কাঁতা টেনে শুইয়েচে,—রূপুসি!—মাইরি!—তোর মতো স্যায়না ঘাগীও যে একটুতেই—

নফর। ঘুমো ঘুমো!

কুঠে। নপা, শোন।—মাগীর অত আদিখ্যেতা ক্যানে, ঠাউরেচিস কিচু?

নফর। না।

কুঠে। তোর ট্যাকেটাকে যদি দু'একটা পয়সা থাকে···ভুলিয়ে ভালিয়ে গাপ করবার মতলবে—

নফর। থাম্! (খানিক চুপ করে থেকে) ঠানদি! মাইরি, তু' টের পেলি কি ক'রে? তাই ত' বলি—

কুঠে। হেঁ হেঁ বাপ,—আমরা হলাম গে সে আমলের জীব, এ'করেই জন্ম কাটালুম!—ওসব দমবাজি কি আর আমাদের ঠেঁয়ে চলে!

নফর। (আপন মনে) তাই!—নইলে, কতা নেই, বাত্তা নেই, —খামখাই—

কুঠে। হাড়-শয়তান! হাড়-শয়তান! ছেনাল মাগী!—যে রুপের ছিরি,—ওই নিয়ে আবার যায় মানুষ পটাতে! ঘেন্নায় মরি!···পিসি আজ এ্যায়সা ঠোকাই ঠুকেচে—দেকিস্ নি বুজি?—হোতা—পিসির ঘরে। বলচে,—কাল ভোরের মধ্যে যদি দস্তুরি না ছায়, তবে দল থেকে বার করে দেবে। খেতেও ছায়নি সারাদিন কিচু—

নফর। গুবরেটা মড়ার মতো ঘুমুচ্চে ছাক! তকন থেকে সামনে নাক ডাকাচ্চে! এই গুবরে!—এই কানা!

কুঠে। ডাকিস্নি, ডাকিসনি।—

নফর। ক্যানে?

কুঠে। উটেই পোঁ ধরবে!—ওর গান শুনলে, মাইরি, আমার হাত পা হিম হয়ে আসে।

নফর। আসুক। আমরা ঠায় জেগে থাকব, আর তোফা ঘুম লাগাবে ওরা,—সেটি হচ্চে না!—এই শালা—ওঠ না।

কানা মোড়ামুড়ি দিয়ে ঘুমের ঘোরেই হাত বার ক'রে বিড়বিড় ক'রে বলল,—জয় হোক রাজা বাবা! একটা—

নফর। (হেসে উঠল) ঢেঁকি স্বগগে গেলেও ধান ভানে!··· এই ভূত! হেতা তোর বাবা-টাবা কেউ নেই—ওট শুয়োর!

গুবরে! (ভালো চোখটাও মেলে জড়িতস্বরে) ধুশ—শা— মাইরি—বেড়ে ঘুমটা এয়েছল।—কে ডাকচো বাবা?—ওঃ—(সুর ক'রে) গয়লা দিদি লো—ও তোর···ময়লা বড়—ময়লা বড়—

কুঠে। ওরে—রাক্ রাক্···

গুবরে। প্রাণ!

কুঠে। (নফরকে) বলেচি!—মাইরি নপা,—আমার গা জ্বলে যায় শুনলে···

গুবরে। (কুঠে বুড়ির দিকে ভঙ্গী ক'রে তাকিয়ে)—মাইরি ঠানদি!—মাইরি? (সুর ক'রে) দাঁতে মিশি, ঠোঁটে হাসি,—ঠানদি মেরে জান!

কুঠে। (অসহায় আক্রোশে) নপা—

নফর। (হেসে উঠল)—থাম গুবরে! বলি তোর ঘাড়ে আজ কি চেপেচে বল্ ত! ষাঁড়ের মত ঘুমচ্চিস?—খুব টেনেছিলি বুঝি?—

গুবরে। পয়সা লাগে, সোনার চান, পয়সা লাগে! খুব টানবার কড়ি পাব কোতা?—তা নয়। অমনি ঘুমই আমার খুব জমাট—

কুঠে। (আপন মনে, অস্ফুট স্বরে) কবে যে একেবারে ঘুমুবি!

গুবরে। (নফরকে) কুটে মাগী কি বলে রে?—বিড়বিড় করচে গ্যাক না?

কুঠে। কি! যত বড় মুখ না তত বড় কতা!—কুটে মাগি! বলি তু' কোতাকার রাজপুত্তুর এলি রে!—নিজের ছুরৎ দেকিস্ না!—ঘাটের মড়া!—

গুবরে। চোপ!—মু' খারাপ করিস নে, খবর্দার!—দোব গেলে চোক দুটো···আমার পরী রে!

অসহায় অবস্থার কথা মনে হয়ে বুড়ির স্বর নরম হয়ে এল।

কুঠে। (নাকিসুরে) তা ত' বলবিই রে—একন ত' যা তা বলবিই! ছেলে বিয়োলে তোর মত দু'দশ গণ্ডা কানার জন্ম দিতুম আজ,—তুই কি না—

গুবরে। তা—তা—তা তাই-নাকি!—তা দুঃকু কি!—হাল ছাড়িস নি!—

নফর ও গুবরে পরমানন্দে বিকট উচ্চহাস্য করে উঠল। কুঠে বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে পাশ ফিরে চোখ বুজল।

গুবরে। ফকরে ফেরেনি?—সদি কোতা?—

নফরে। কোতা মরতে গেচে!—উঃ হু রে!—উঃ—(যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করল)

গুবরে। কি রে!

নফর। কিছু না! এই কোমরের ঘা-টা—

গুবরে। তড়পাচ্চে?—যেমন কম্ম।—একটুতেই হুস হারাবি তুই—কৈ বাবা!—আমরাও ত' বাকি রাকিনি কিছু—আমাদের ত' কখনো—

নফর। মোড়লি থাক্। ঘুমো।

গুবরে। যেমন বাচবিচার নেই—

নফর। ঘাঁটাসনি!—যদি ভালো চাস ত—

গুবরে। ইঃ—কি করবি! বলব না?—একশ' বার বলব, হাজার বার বলব—ঘেয়ো কোতাকার—

ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে উঠে নফর আচমকা এসে কানার টুঁটি চেপে ধরে তার মুখে ঘুষি মারতে লাগল। কানা প্রবলতর শক্তির কাছে অসহায়ভাবে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

নফর। ক্যামন—ঘেয়ো—না?—কি?—

গুবরে। ছাড় মাইরি!—লাগচে।—দোহাই তোর—

নফর। মনে থাকে যেন!

ক্লান্তভাবে এসে ও নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

গুবরে। (হাঁপাতে হাঁপাতে)—শালা!—

নফর জবাব দিল না। গুবরে দম নিয়ে ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে ধরাল।

গুবরে। (সুর ক'রে)—জংলা পাকি—পোস মানে—হায় হায় জংলা পাকি—নপা!—শালা ঘুমুচ্চে!—আবার আমায় বলে কিনা ষাঁড়?—জংলা পোসা হোলো দায়!—হা রে—জংলা পোসা—

বিড়িটানার সাথে সাথে সুর ভাঁজতে লাগল গুবরে। বাইরে ফকরের আওয়াজ শোনা গেল : মাইরি ?—কদ্দিলে ? আট আনা—বলিস কিরে !—ওকি ওকি—খাসনে, খাসনে !—পাঁচ ছ' ভাঁড় ত' আগেই সাবাড় করিচিস—

কথা কইতে কইতে ফকরে ও সদি ঘরে ঢুকল ! সদির হাতে এক ভাঁড় তাড়ি। মুখ চোখ শুকনো—ফোলা ফোলা। হাতপা থরথর করে কাঁপছে। ঘরে ঢুকে সে ভাঁড়ের তাড়িটুকু গলায় ঢেলে, টলতে টলতে কুঠে বুড়ির পাশে নিজের জায়গায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল। শুয়েই বুড়ির মাথার কাছে হড়হড় করে খানিকটা বমি করে ফেলল।

ফকরে এসে বেহুঁশের মতো গুবরের ধারে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

গুবরে। কি বাবা মানিক-জোড় !—খুব লুটে এলে !

ফকরে। ওই বেটি—মাইরি !—পিপে ! আমার চারগুণ—

সদি। মিচে ক—অথা কোস্‌নি কো—ও—ওয়াক !—ম—ওটে ত' ছ' ভাঁড়—

গুবরে। বাহবা !—বেঁচে থাক মাইরি,—পিসির মুক রাখতে পারবি !—

ফকরে। শুধু তাই—আবার রোজগারও করে এল এর মধ্যে—

সদি দু'একবার ওয়াক ওয়াক করে জড়িতস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। একটু পরেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

ফকরে। নপা ঘুমুচ্চে !—ওকি—ডিবেটা জ্বলচেই !—সেই সন্দ্যে থেকে ?—নেবা—নেবা। (ছেঁড়া কলাপাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল)—রাত পুইয়ে এল বোধহয় !—কাক ডাকচে !—

গুবরে। অত ভাবনা কি বাবা ! পিসি কড়ি আদায় করতে আসবে, তার আগে রাত পোয়ালেই বা কি, আর না পোয়ালেই বা কি ?

ফকরে। তারও……! দেরি নেই! ময়লা গাড়ি চলচে পতে—

গুবরে। বয়ে গেচে।

একটু উসখুস করে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘর অন্ধকার, ঘুটঘুটে। বাইরে একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে ঘটাঘট করে ময়লা ফেলা এক্কা চলতে শুরু করেছে। কুঁড়েটার মধ্যে সব চুপ। বাইরে রাতের সুপ্তির পর সদ্যোত্থিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রভাতের সজীবতা এখনো পটলডাঙার পচা পাঁকের পাহারা পেরিয়ে আস্তানার কুঁড়েগুলোর ভেতরে উঁকি দিতে সাহস পায়নি।

এমনি ঘণ্টাখানেক।

কুঠে বুড়ির ঘুম ভেঙেছে সবার আগে। বন্ধ ঘরে চোখ মেলে, খানিক ধন্দ ধরে থেকে আঁধার সরে গেলে পর, তার নজর পড়ল সদির ওপর।

কুঠে। মর, মর!…সারারাত কেলি করে গড়ানো হচ্চে ত্যাক্‌না! বলি অ' রুপুসি!—বেঁহুশ হয়ে ঘুমুচ্চে।—ঘর ম' ম' করচে গন্দে;—কত গিলেচে!—রেকেচে কি ছাই এক ফোঁটাও!—এই নুলো ওট্‌ ওট্‌—দুকুর বেজে গেল যে!

উঠতে গিয়ে বুড়ির হাত ঠেকে গেল সদির আঁচলে। রাতের রোজগার আট আনা পয়সা তাতে বাঁধা ছিল; এদিক ওদিক চেয়ে ঢোক গিলে, বুড়ি সেটা বার করে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠে, ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়াল।

কুঠে। দুগগা—দুগগা! ওরে নুলো—ওঠ্।

ফকরে। (হঠাৎ ঘুম ভেঙে, বুড়ির সাড়া পেয়ে) দাঁতে মিশি ঠোঁটে হাসি,—

কুঠে। (আঁতকে উঠে)—রাম রাম!

গুবরে। কি বাবা, ভূত ঝাড়চ?—ঠানদি মেরে জান্—হারে ঠানদি মেরে জান।

কুঠে। মর্ মর্!

ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বেরোল কুঠে।

গুবরে। চললি নাকি? (সুর করে) গুঁড়ি সুড়ি, কুঠে বুড়ি, চোল্‌ল নিয়ে প্রাণ!—হায় হায়!

অকথ্য ও অশ্রাব্য গালাগাল করতে করতে বুড়ি চলে গেল। গুবরে আপনে মনে খুব খানিক হোহো করে হাসল। তারপর আর একবার পাশ ফিরে চোখ বুজল।

দোরগোড়া থেকে মোড়লনীর বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা গেল: নপা, ফোকরে, গুবরে, সদি!—এই চার নম্বরের বাসিন্দারা! —ওট্ ওট্!

খেঁদি ঘরে ঢুকল। গুবরে উঠে বসল।

গুবরে। ধর।

খেঁদি। (পয়সা গুণে ট্যাঁকসই ক'রে) আর মড়াগুলোর হয়েচে কি?—দে ত'—দে ত'—চুলের মুটি ধরে উটিয়ে দে সব কটাকে! —লবাবের লাতি সব!

গুবরে সবাইকে এক একটা হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফকরে উঠে চোখ রগড়াতে লাগল।

খেঁদি। লে' লে' দস্তুরি বার কর!—কাজে বেরো। হোতা কে ওটা? সদি?—তবে রে মাগী, মিনি পয়সার পেয়ারি!—এই—ওট্ ওট্। (পা দিয়ে মাথায় গুঁতো দিল) বজ্জাত মাগী!—কই লা, দস্তুরি কোতা?—বার কর শিগগির!—কালকের দু'আনা,—আজকের দু'আনা—

সদি। (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে বসে) দিচ্ছি! —গালমন্দ করিসনে সকালবেলা—

খেঁদি। ইল্!—পুজো আচ্চায় যাবি নাকি লো?—বলি, বড় যে—

সদি আঁচল টেনে পয়সা না পেয়ে, পাগলের মতো কাপড়-চোপড় ঝাড়তে শুরু করে দিল। কাঁথা, কম্বল,—কোথাও না পেয়ে সে ডুকরে উঠল।

খেঁদি। ঝাড়ফুঁক শুরু করলি যে!—পয়সা কোতা?—ও আবার কি?—আ মর—

সদি। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) পয়সা—আমার পয়সা!—এই আঁচলে যে দু'টো সিকি বাধা ছেল কাল রাতে!

খেঁদি। (একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে) ঢং রাক্। ওসব ভেল চলবে না হেতা! (নীরস কণ্ঠে) পয়সা বার কর।

সদি। ঢং কি? সত্যি মিথ্যে সুধো না ফকরেকে! ছেল কিনা—

ফকরে। ছেল, ছেল!—মাইরি পিসি,—জবর রোজগার করছেল মাগি—

খেঁদি। ছেল ত' গেল কোতা?

সদি। কেও নিয়েচে! নইলে যাবে কোতা! (চারদিকে তাকিয়ে, ফকরেকে) তুই নিয়েছিস্ আমার পয়সা!—বার কর—দে শিগগির—(ফকরের ওপর গিয়ে পড়ে)

ফকরে। (সদির পেটে হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো দিল)—পালা পালা!—আট গণ্ডা পয়সা,—তাই নিতে যাব আমি?—খেয়াল নেই, মাগী!—ফকিরচাঁদ অমন কত আট গণ্ডা উড়িয়েচে কাল একসন্দের ফুরতিতে!—যা-যা!

সদি। (গুঁতো খেয়ে ককিয়ে উঠল)—মা গো!—তবে কি হ'ল আমার পয়সা—কে নিল?···

কান্নায় সদির গলা বন্ধ [illegible]

ফকরে পিসির হা[illegible] পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নফরের ঘুম ভেঙেছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল।

খেঁদি। (পরুষ [illegible]লায়)—শোন সদি! [illegible]তা থেকে পারিস

নে' আয় পয়সা !—ধারে কারবার নেই হেথায় !—তা হোস না তুই বরাবরকার। অতবড় দেহটা,—লজ্জা করে না! যেমনি পারিস, —দিতেই হবে আজ—

সদি। (হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে) আমি ত' এনেইছিনু—তা চুরি হলে—এ নিশ্চয়ই ওই কুঠে বুড়ির কাজ—আমি—

নফর। হোলো কি পিসি? অত বকচিস কার ওপর?

খেঁদি। ছ্যাক না মাগীর রীত !—ধুমসি মাগী, দু'দিন দস্তুরি ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্চে !—কালকের অমন ঠ্যাঙানিতেও মাগীর শিক্ষে হয়নি !—

নফর। হুঁ !—আমার দস্তুরি নিবি নে?

খেঁদি। দে।

নফর। ধর—

খেঁদি। (পয়সা নিয়ে)—কাজে যাবিনে?—না যাস, পড়ে থাক !—ওলো অ' শতেক খেয়ারি !—ধন্দ ধরেই থাকবি, না—

খেঁদি অনর্গল গালমন্দ করে যেতে লাগল। সদির মুখে রা ছিল না, সে মুষড়ে কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। কিন্তু তার অস্ফুট রোদন সমান চলতে লাগল। নিজে দস্তুরি দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজতেই নফরের চোখের ওপর থেকে নোঙরা কুঁড়ের ঘুটঘুটে অন্দর যেন ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গেল। দূর অতীতের কবরের তলা থেকে একখানা মুখ তার মুগ্ধ দৃষ্টির ওপর ফুটে উঠল—বাপের ঠ্যাঙানোকে অভিভূত করে শান্তি প্রলেপের মত যার চোখের জল তার ব্যথাজর্জর সর্বাঙ্গে একদিন ঝরে পড়েছিল, মুখখানা তার।

বদ্ধ দৃষ্টির অস্পষ্ট অন্ধকারে সে একবার শিউরে উঠল। তারপর চোখ মেলে, একটু কেশে খেঁদিকে বলল,—কত পাবি ওর কাচে?

খেঁদি। চার আনা।

নক্কর। ওই হোতা খুঁটির পেছনে গোঁজা আচে। বার করে নেগে যা! সদি ও খেঁদি সমান অবাক হয়ে একসাথে নক্করের দিকে তাকাল।

নক্কর। দিক্ করিস্‌নি যা—আ মোল্লা! চোখ মটকাচ্চিস কেনে।

নক্কর পাশ ফিরে শুল।

খেঁদি বেকুবের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, কথিত জায়গা থেকে পয়সা বার করে নিল। তারপর সদির দিকে একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

সদি বজ্রাহতের মতো একদৃষ্টে নক্করের দিকে তাকিয়ে রইল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের ভেতর আসতে লাগল।

হঠাৎ সদির সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চাপতে সে কম্পিত হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজল।

নুলোটা খেঁদির সাড়া পাওয়া অবধি কতকগুলো ঝুলিকাঁথার তলায় লুকিয়ে ছিল, এইবার মুখ বার করে মিটমিট করে তাকাতে লাগল।

॥ কালনেমি ॥

জোয়ান মরদ ডাকু যখন রেলে পা কাটা প'ড়ে কাজের বার হ'য়ে গেল, তখন এই এত বড় দুনিয়া তাকে বেঁচে থাকবার কোনো পথই বাতলাতে পারল না।

অনেক ঘোরা-ফেরার পর শেষকালে, সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় এসে খুঁটি গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা স্থান দিতে তাকে কোনো আপত্তিই করল না, কিন্তু ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা বরদাস্ত করতে আদপেই রাজী হ'ল না। বলল, থাকবি থাক! কিন্তু ইস্তিরি-ফিস্তিরি ক্যানো বাবা! এখোন ও সব চলবে না, মুড়িমিছরির একদর হেতায়!

শুনে, ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠল। বলল, শুনছিস তো ময়না? এরপর—

ময়না বলল, আর কোথায় যাবি তবে? আজ দু'মাস ত' সমস্ত পিরতিমি ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোথাও? মাথা গোঁজবার কুঁড়ে যখন মিলেচে একটা, তখন আর তোকে টো-টো ক'রে বেড়াতে দিচ্চিনে! আমার কতা? কি করবে ওরা আমার! সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না!

ডাকু বলল, সব বুঝলাম। কিন্তু শুনলি ত'! একে ওরা দলে ভারি, তার ওপর—

—থাম তুই! দলে ভারি! আমার কাটারি থাকতে ওই মড়ার দলকে ভয় করি আমি?

স্ত্রীর শ্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনা ভাবে ডাকু বলল, থাক তবে। কিন্তু—

—আর কিন্তু করিস্‌নে তুই—

তারা থেকে গেল।

কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেমনি দলের সাথে মিশে উঠতে পারল না।

মেশবার জন্যে ব্যস্ততাও তাদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসত। তারপর দলের সাথে পথে বেরিয়ে পড়ত। দুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধ্যের আগেই আবার রেখে আসত। রাত বারোটা-একটায় তাকে নিয়ে এসে দুজনে শুয়ে পড়ত। রোজকার রোজ এমনি কাটত। কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হ'ত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।

হরিমতির ঘরের রত্না একদিন সন্ধ্যের সময় অনেকের সামনেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও-পাড়ায় এসব নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক দু'সেকেণ্ড পরে যা ঘটল, তার সাথে পরিচয় কারোই ছিল না। দু'হাতে নাক চেপে ধ'রে ভুঁয়ে প'ড়ে রতন গোঙাতে শুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে গম্ভীরভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রসিকতার জের স্বরূপ নাক দিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বসল।

পটলা বলল, হয়েছিল কি রে? একটা মাগীর হাতে ম্যাড়া ব'নে গেলি?

কাৎরাতে কাৎরাতে রতন বলল, এমন আচম্‌কা ঘুষি চালালে মাইরি, তাল রাকতে পারলুম না! আর একেবারে নাকের ঠিক ডগাটায়—উঃ—

একটা বছর আটেকের মেয়ে বলল, থাক থাক—আর কতা ক'স নে! অমন ষাঁড়ের মতো মরদ—লজ্জা করে না!

তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতনা বলল, আচ্চা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও নেব! ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারি তো—

পটলা বলল, থাক, হয়েচে। একন ঘরে যা ত'। নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেচে।

তীব্রদৃষ্টিতে ময়নার ঘরের দিকে তাকিয়ে রতন টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকল।

যে যার গর্তে ডুব মারল।

এর মধ্যে ময়নার এক ছেলে হ'ল। ছেলে নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে, সবারই কাছে বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিনরাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওয়ানো, কত কি! স্বামী স্ত্রী দু'জনেই রোজগারে বেরোনো ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল, তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।

খেঁদি-পিসির দলে যে এটা খাপ খাবে না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হ'ত, একটি বছরও কামাই পড়ত না! কিন্তু ওই হওয়া পর্যন্তই। তারপর, সে সব শিশুদের ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশির ভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশজনের মতো বন্ধনহীনভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মা'র ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না। তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।

মেয়েগুলোকে বয়স হবামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হ'ত! দলের এ একটা মস্ত আয়। ছেলেগুলো পকেটকাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।

এই সেখানকার নিয়ম।

এ-হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে ঢলাঢলি শুরু

করল, তখন সবায়ের কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা ব'লে মনে হ'ল।

খেঁদি বলল, ঘেন্না ধরালে! একি ভদ্দরনোকের ঘর নাকি লা? সোমত্ত মাগী, কোতায় দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেকবি, তা না, সোয়ামি, সোয়ামি করেই গেল! আবার একটা কাঁটা খসেচে ত' কি নাগিয়েচে দ্যাকোনা! বলি, তু' মরলে ওকি তোর ছেরাদ্দ করবে?

ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখত না।

ছেলে মাস দু'আড়াইয়ের হ'লে তারা আবার রোজগারে বেরোতে শুরু করল। বুড়ি হরিমতির ময়নার ওপর একটু টান ছিল, সেই থাকত ছেলের পাহারায়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে রাস্তার মোড়ে ডাকুকে রেখে ফিরে আসচে। আস্তানার গের্দর ভেতরে পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

—কি বাবা, বড় যে তেজ ফলিয়েছিলে সে-দিন!

তাড়ির গন্ধে চারিদিক ভ'রে গেল।

ময়না বলল, পথ ছাড়্—

—ফোঁস কেউটের ছা, কম নয় তার হাঁ—মাইরি, ছুবলে দিয়ো না যেন! আজও কি ঘুষি চালাবে নাকি—, ব'লে সে ডাকল, পটলা—

ময়না তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরটা থেকে আরো দু'জন নেমে এল। তার ভয় হ'ল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বলল, কি চাস তোরা, শুনি?

—হুঁ বাবা, পতে এসো! গুটিগুটি ওই ঘরটিতে ঢুকে পড়ো তো জাদু, না বেইজ্জৎ হবার শক আচে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে ময়না বলল, আচ্চা, একটু সবুর কর না তোরা! ছেলেটাকে

ছেড়ে এইচি চেরখন, এক পাক তাকে দেকেই আমি চলে আসব।

পটলা বলল, যেতে দাও, যেতে দাও, ছেলে দিয়ে কি হবে? ছেলে আর দেকতে হবে না! বেঁচে থাকলে অমন কত ছেলে হবে, —ছেলের দুঃখু কি বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাটল,

আমার সাগর-পারের ময়না
শিকলি বাঁধা যায় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
যাবার কতা কয় না!

ছিঃ মানিক, অমন কতা কইতে আচে?

ময়না দেখল মহাবিপদ। একমাত্র সম্বল ছুরিখানা, তাও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সাথে লড়া ত' সম্ভব নয়।

এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সে ছুট দিল। পটলা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধরল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুটতে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

—ভেল্কি দেখাবার আর ঠাঁই পেলে না ধন! চল দিকি একন সুড়সুড় ক'রে—কত ভেল্কি জানো ওই ভেতরে গ্যাকাবে চল—

ময়না ঝাপটা-ঝাপটি কাকুতি-মিনতি অনেক করল। কিন্তু খিদে আর পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেছে, মিনতিতে তাদের মন ভিজবে কেন?

তিন জনে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। ডাকু পথের ধারে বসে হয়রান হয়ে উঠেচে। ময়নার আসতে এত দেরি ত' কোনদিনই হয় না?

আরো খানিকক্ষণ ব'সে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর ক'রে

উঠে দাঁড়ালো। তারপর একাই ঢিকোতে-ঢিকোতে আস্তানার দিকে চলল।

সেখানে পৌঁছেই সে দেখল, মহা হৈ-চৈ বেধে গেছে। সামনেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বলছিল, তা এতে আর দোষের কি হয়েচে বাছা! রতনাকে তো ছুঁড়িরা পছন্দই করে! তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব।

ময়না এক কোণে এলিয়ে পড়েছিল। মাথায় চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকনো, চোখ তু'ইঞ্চি বসে গেছে।

খেঁদি বলল, একানে পড়ে থেকে আর কি করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তাও বলি, যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে ত'? পেট চালাবার জন্মে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামি ইস্তিরি ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।

ঠিক ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে, ময়না ঘরে আসতেই সে বলল, তু' কিছু ভাবিসনে ময়না, দোষ আমারি!

ময়না বলল, তু' একটা বিহিত করবিনে! এমনি ক'রে—

তু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ডাকু উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বসল। একটু চুপ ক'রে থেকে তাকে বুকে সাপটে ধ'রে লালসাজড়িতস্বরে বলল, তা হোকগে —থাকতেই হবে যকন হেতায়, তকন কি হবে ঘাঁটিয়ে!—আয় তুই—

ময়না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভুখের জ্বালা! মত্ত পশুর মতো তু'চোখ জ্বলছে।

—রতনা তো? আর কেউ ছেল'? ব'লে ডাকু তাকে কোলের ওপর টানতেই সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর একহাতে চোখের জল মুছে আরেক হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না?

—রতনার কাছে—

সে চলতে শুরু করল।

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলচে, দোহাই তোর, একটি বার আসিস রেতে—

॥ মন্থশেষ ॥

সন্ধ্যের মহড়ায় চোরের মতো ইদিক-উদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে আস্তানার গের্দয় পা দিতেই বাঞ্ছার কানে এল খেঁদি-পিসির কটকটে বাজখাঁই গলার আওয়াজ, কি রে মড়া, হয়েছে কি? অত হাঁপাচ্চিস কেনে? কি ওটা তোর কাঁকে?

—চুপ, চুপ—চ' উদিকে, ঘরের ভেতর বলচি—

—আ মর্! কি এমন রাজ্যি জয় করে এলি যে—ওমা! উকি রে! কার ছ্যানা—

—মাইরি পিসি, দোহাই তোর। ঘরে চ'—মহাকাণ্ড হয়ে গেচে।

বাঞ্ছা তখনো প্রাণপণে হাঁপাচ্ছে। তার কাঁধের পোঁটলা থেকে অদ্ভুত গোঙানির শব্দ হতেই সে পটাপট দু'তিনটে থাবড়া ক'ষে অস্পষ্ট ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, থামনা শূয়োর, একেবারে গলাটিপে ঠাণ্ডা করে দেব—

তারপর সভয়ে বার দু'তিন পেছনে তাকিয়ে বলল, চ' পিসি—

ঘরে ঢুকে, ঝাঁপটা টেনে দিয়ে খেঁদি বলল, নে' একন, বার কর দিকি কি এনেচিস—

বাঞ্ছা টিপ ক'রে কোল থেকে বছর চার-পাঁচের একটি ফুটফুটে ছেলেকে ঘরের মেঝেয় নামিয়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে ছেলেটা আর একবার কেঁদে উঠতেই সে গলা টিপে ধ'রে ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, চুপ, হারামজাদা, চুপ। একরত্তি জীব, দাপট ছ্যাক্ না।

বেধাবড়া ধমক আর মারের দৌলতে ছেলেটির সুবুদ্ধি হয়েছিল, সে সত্রাসে চুপ করল।

খেঁদি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ত্যক্তভাবে বলল, করচিস কি। দলসুদ্ধ হাতে দড়ি দেয়াবি নাকি?

বাঞ্ছা বলল, দলফল যাক চুলোর দোরে, নিজের হাত দুটো ত, বেঁচেচে! বাপ্, আর একটু হলেই—

খেঁদি তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, নে, কপচাস্ পরে, কি হয়েছিল বল—

—বলচি। রাজাবাজারের মোড়ে ওই যে বড় বাড়িটা না, ওই যে লাল রঙের দেউড়িওলা—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পরামানিকের বাড়ি—

ছোঁড়াটা হোতাকার। সন্দের আগথানটাতে খেলতে খেলাতে খানিকটা ইদিকে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসছিনু শ্যালদার দিক থেকে। হঠাৎ নজর পড়ল ছোঁড়ার গলার দিকে। দেকি কি, গ্যাসের আলোয় গোট গোট কি যেন ঝক্‌মকিয়ে উটল! ভাবনু, সাপ-ব্যাঙ যাই হোক বাবা, ও আমি না হাতিয়ে ছাড়চিনে! ছোঁড়া আপন মনে চলছিল, আমিও মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে ওঁৎ পেতে সাত ধরনু।

—নিকুচি করেচে তোর সাত-ধরার, মাল সরালি কি করে তাই বল—

—ভড়কে দিসনি পিসি, বলচি। শিক-কাবারের দোকানের পাশের এঁদো গলিটার মুখে এসে যেই ছোঁড়া দাঁড়িয়েচে, আমিও ওমনি না তাক বুঝে, এক লাপে ওর ঘাড়ের ওপর! মুক চেপে ধ'রে হিড়হিড় করে নে' এলুম গলির ভেতর! ছোঁড়ার তকনকার ভাবখানা যদি দেকতিস পিসি! ঝট্‌পট্ কেতেন চিতেন, টোপগেলা বোয়ালছানার মতো দাপাচ্চে! হারটা পেরায় কায়দা করে নে' এনেচি, য়্যামন সময় দেকি একব্যাটা লালপাগড়ি গলির ঠিক মুকটাতে, চোক ত' চড়কগাছ! জান থাকতে অমন রোজগারটা ভেস্তে যাবে, মাইরি আর কি! কিন্তু সাত-পাঁচ ভাববারও ত' আর সময় নেই, শালা এগুচ্চে! বোঁ করে ছোঁড়াটাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নে' ওর জিব্‌টা না টেনে ধরে দিনু ছুট! ছুট ত' ছুট—

একদম আস্তানার গের্দয় পা দিয়ে তবে হাঁপ ছেড়িচি!—বাপ! কম ভুগিয়েচে গুয়োটা! আর শালার কি ওজন পিসি, এই তোর গা ছুঁয়ে বলচি, মাইরি, দেড়মনের কম হবে না! কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েচে!

খেঁদি সব শুনে, খানিক চুপ ক'রে বসে থেকে বলল, আচ্ছা, নিয়ে ত' এলি, একন সামাল দিবি কি ক'রে? কচি কাচা নয়, পুরুষ্টু মাল! হুজ্জৎ বাদালি তুই!

বাঞ্ছা বললে, হুজ্জৎ আর কি! হারটা খুলে রাক, তা'পর রাতারাতি ওকে পার করে দিয়ে আসি ফটকের কাছে—

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বলল, বলিহারি তোর বুদ্ধি। এতক্ষণ বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেচে না? ওদিক মাড়ালেই ত' হাতে বেড়ি পড়বে। তা ছাড়া ছোঁড়াটাও তো আর চোক-কান বুজে নেই, অনেক কতা ত' ওই ফাঁস করবে!

—ফাঁস করবে না আমার এ করবে! রাস্তাঘাট চেনা কি ওর কম্ম, ওইটুকু ত' ছোঁড়া! তোর যত গুলিখুরি—

—তোর পিণ্ডি! আস্তানাটা তো দেকচে, একটু বললেই পুলিশে টের পাবে। চক্কুর লীলে-খেলা ত' আর বেশি দিনের কতা নয়—

জবাব দেবার কিছু নেই। বাঞ্ছা চুপ করল।

খানিক ধন্দ ধ'রে থেকে খেঁদি বলল, আমি বলচি—

হঠাৎ একটা চুমকুড়ি কেটে বাঞ্ছা চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক, ঠিক, হয়েচে! শোন—

দাঁত কিড়মিড় ক'রে খেঁদি বলল, আস্তে মড়া, আস্তে!

বাঞ্ছা সামলে নিয়ে গলা খাটো করে বলল, আচ্ছা। তারপর খেঁদির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফাস শুরু করল। সারা হলে, মুখ সরিয়ে এনে, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, কি বলিস্?

খেঁদি একলহমার জন্যে একটু শিউরে উঠে বিকৃত সুরে বলল, বেশ বেশ! আর তা ছাড়া পতও ত' দেখিনে কিছু!

ছেলেটা অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে চুপ করে ছিল, এইবার খেঁদির আঁচল ধরে ফুঁপিয়ে উঠল,—না—মার কাছে যাব!

খেঁদি চমকে উঠে চোখ কটমটিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

—যাবে বৈকি সোনাচ্চাদ! এই নে' গেলুম বলে! এখন একটু থির হ'য়ে বোসো ত' মানিক! ব'লে, বাঞ্ছা হারটা খুলে খেঁদির হাতে দিয়ে বলল,—নে, ধর। আদাআদি বাবা,—তার কমে পোষাবে না!

খেঁদি হারটা মুঠোজাত করে বলল···ঢং রাক! হামেশা যা হচ্চে, তাই পাবি,—বারো আনা, চার আনা—

বাঞ্ছা ঘোরতর আপত্তি করে বলল, দোহাই তোর, মজুরি পোষাবে না! করতে কম্মাতে ঝককি পোয়াতে বাঞ্ছারাম, আর পায়ে পা রেখে লাভের কড়ি গোনবার ব্যালা তুই? আর এটাতে খাটনিও জবরদস্ত!

খেঁদি আর না ঘাঁটিয়ে বলল, আচ্চা, ছ'আনা নিস্। মড়া ছিনে জোঁকেরো বাড়া—

এমন সময়, পিসী ঘরে না কি গো, ব'লে ঝাঁপ ঠেলে বছর সাতাশ আটাশের একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। গায়ের বরণ তেল-চুকচুকে, কপালটা ঢিবি, হাতুড়ি-পেটা নাকটার তলা দিয়েই হারমনিয়মের চাবির মতো একসার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। চোয়ালটা কানের কাছে চৌকো হয়ে সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

সে ঘরে ঢুকেই বলল, ওম্মা! কার ছেলে গো পিসী! দিব্যি—

খেঁদি জিব উল্‌টে বলল, আ মর্, ঢং দেকে আর বাঁচিনে। ছেলে যারই হোক, তোর তা দিয়ে কি কাজ লা?

দাঁতী বলল, আহা চটিস্ কেনে পিসী। তোর যে নয় তা জানি, তবে উড়ে ত' আর আসেনি, তাই সুধোচ্চি।

ছুরৎ যাই হোক, দাঁতী গুণের মেয়ে। বয়েসগুণে ভিক্ষে ছাড়াও

তার রোজগার ছিল মোটা, খেঁদির তা অজানা ছিল না। সে একটু নরমসুরে বলল, বাঞ্ছার রোজগেরে মাল।

দাঁতী সহজ সুরে বলল, বটে।

সে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসল। তার খামখা ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটির গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ছ্যায়, একটু কোলে নিয়ে···ধ্যেৎ।

ছেলেটি আবার এমন একটি নতুন জীব দেখে ভড়কে গেছল, কিন্তু দাঁতী কাছে এসে বসতে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

দাঁতী একটু বিব্রত হয়ে অন্যদিকে তাকাল। তারপর বাঞ্ছার দিকে ফিরে বলল,—তোর আবার ছেলে পুষবার সক্ গেল কবে থেকে রে?

বাঞ্ছা ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, ন্-নিকুচি করেচে তোর সকের। তা'হলে একনি নে'যাব পিসি? আমার কিন্তু আর তর সইচে না।

খেঁদি বলল, বোস্।

ছেলেটি এতক্ষণ দাঁতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইবার হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। তার অব্যক্ত গোঙরানির ভেতর থেকে একটি কথা শুধু বোঝা গেল······মা।

দাঁতের দৌলতে দাঁতীর মুখে কোনো ভাবের ছাপ পড়লেও সহজে ধরা যেত না। অসাবধানে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—আহা। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিয়ে বলল, আ-মর।

খেঁদি তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গলাটা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, যা না লো মাগী, সঙের মতো হেতা বোসে আহা উহু শুরু করলি কেনে? ঘর যা। কোতা দু'পয়সা উপায়ের পত দেখবি, না—

দাঁতী ঝাঁঝের সাথে বাধা দিয়ে বলল, আ মর্। আমার রোজ-

গারের দুঃখে তোর তো ঘুম হচ্চে না। তোর যদি অসুবিধে হয় ত' বল, যাচ্চি। বলি আজকাল কি—

পিসী সত্যিই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কপাল! কিন্তু তাও বলি, ড্যামাক দ্যাকাস্‌নি। বয়েস কালে তোর দুনো রোজগার করেচি আমরা।

দাঁতী হেসে বলল, পিসী দুঃখ করিসনি। একনো দু'এক পোঁচ লাগিয়ে পরিপাটি করে চুলটুল বাঁধলে—চাইকি,—

বাঞ্ছা বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাশতে কাশতে বলল, ঘেন্নাঘাঁটী করিস নি বিন্দি! যা তুই, আমাদের একটু কাজকম্মের কথাবাত্তা আচে।

বিন্দি-দাঁতীর শেষ দিকের কথাবার্তাগুলো পিসীর ভালোই ঠেকছিল, কিন্তু কাজকর্মের কথা কানে আসতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, যা। শোন, উল্টোডিঙ্গীর ছুঁড়িটা ওই কোনার পূবদোরি ঘরে বন্দ আচে, এই চাবি নে, রতনা এলে দিস।

একটা গোপন কিছুর আঁচ পাবার পর থেকে বিন্দীর ওঠবার আর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জলে থেকে কুমিরের সাথে বাদ করা সম্বন্ধে ওই যে কি একটা প্রবাদ আছে, সেইটের কথা মনে করে তাকে উঠতে হ'ল। সে বলল, উঠচি। ছেলেটাকে নে' গেলাম পিসী, দরকার হলে নে' যাস।

বাঞ্ছা হাঁ হাঁ করে উঠল, রাক্ রাক্, নাবিয়ে দে! মাগীর বলা নেই কওয়া নেই—

খেঁদি একটু অবাক হয়ে বিন্দির মুখের দিকে তাকাল! তারপর কি ভেবে বলল,—আচ্চা, নে'যা। কিন্তু ঢাক পিটে বেড়াস নে যেন! নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও বারও করিসনে!

বিন্দি বলল, আচ্চা। তারপর ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঝাঁপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে বলল, আচ্চা পিসী, ছেলেটাকে যদি পুষি? দিয়ে দিবি আমায়?

বাঞ্ছা লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, খেঁদি তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, তা কি হয় লা মুকপুড়ি ? হেতা ছেলে পুষবি কি ? ও যার ছেলে তাদের দে' আসতে হবে, তু' দিয়ে যাস খানিক বাদে—

দাঁতী কিছু বুঝল কিনা সেই জানে, ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বাঞ্ছা কুঁদে উঠল, তোর আক্কেলখানা কি বল্ ত' ? ওকে হাত-ছাড়া করলি যে বড় ? একন, ককন দিয়ে যাবে তারি পিত্যেশে বসে থাকতে হবে।

খেঁদি তাড়া দিয়ে বলল, চুপ ক'রে বোস্। ও মুকপুড়ির সামনে তুই অমন কুঁদে কুঁদে উটচিলি কেনে বল ত' ? আমি যা করি সে সবদিক ভেবেই করি। কিন্তু তোর চালচুল দেকে ত' ও টের পেয়ে গেচে যে, ভেতরে কিচু গলদ আচে !

বাঞ্ছা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, বিন্দি টের পেলে ত' ভারী—

—ভারী নয়। কারুকে বিশ্বাস নেই, ওসব পিরিত-ফিরিতের ঠাঁই হেতা নয়। কত মিন্সে আসে ওর ঘরে, দু'কান হ'তে কতক্ষণ ?

—তবে ত' যে বড়' ছ্যানাটাকে ছেড়ে দিলি ?

—সে আমি ঠিকই করেচি। না দিলে ওর সন্দ হত, একুনি গে ঢাক পিটে বেড়াত। নে' গেচে, এখন ঠাণ্ডা থাকবে খানিক। তু' এর ভেতর যোগাড়-যন্তর সব ঠিক ক'রে রাক্, মাঝ রাতের আগে কিছু হবে না, রাত পোয়াবার আগেই খাল পার ক'রে দিয়ে আসতে পারবি।

—যোগাড় ত' কচু ! ওই তো জীব ! গলায় আঙুল দিলেই—

—উঁহু। তাতে বিপদ আচে। আস্ত অতবড় লাসটা নে যেতে গেলেই ধরা পড়বি। কেটে-কুটে না নিলে···যন্তর-পাতি কিছু নেই ?

—আমার সেই বড় বাঁক ছুরিখান—

—তাতেই হবে। ব'লে খেঁদি উঠল।

দরজার কাছে এসে বলল, বিড়ি আচে? দে একটা। একন যা,···হ্যাঁ, গোটা দুয়েকের সময়, যা;

অন্ধকারে প্যাচপেচে কাদার মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বাঞ্ছা শুনতে পেলে, ওধারে বিন্দির কুঁড়ের দোরে দাঁড়িয়ে দলেরই দু'জন মরদ মত্ত-কণ্ঠে হল্লা জুড়ে দিয়েছে, বি···ন্দি ···দ-দোরটা খোল মাইরি···! র···রাত যে পুইয়ে গেল ব্···আওয়া······!

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বিন্দি তাড়া দিয়ে উঠল, সরে পড় ভালো চাস ত'! মর মর! নইলে ঝেঁটিয়ে রস ঝেড়ে দোব!

বিন্দির ব্যবহারের রকমফের দেখে একটু অবাক হয়ে বাঞ্ছা গান ধরল, গয়লা দিদিলো—

খেঁদির ঘরে ছেলেটাকে দেখা অবধি বিন্দির বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে পড়া কোন্ একটা তারে কেবলি কাঁপন উঠছিল, তাতে তার নিজেরি থেকে থেকে অবাক লাগছিল।

পেটের খিদে, সারা গায়ে খিদে খিদে, এ সবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না; সে খিদের তৃপ্তির পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কিসের এ খিদে! এ একদম নতুন! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দু'গাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো···আরো—কিন্তু আশ মিটছিল না।

ছেঁড়া কাঁথা, কম্বল, এঁদোগলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কাৎরানি, খিদে ও পশুলালসার হাহাকার, এরই ভেতর সে আজন্ম প্রতিপালিত। তাই মনের ওলট-পালট মাঝে মাঝে তাকে অবাক করে দিচ্ছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাববার মতো মনের অবস্থাও তার

ছিল না, শক্তিও না। খালি মনে হচ্ছিল, জলের তোড়ে নদীর পাড় ধসে পড়ার মতো মনের মধ্যে কিসের যেন ভাঙন শুরু হয়েছে··· একটু ভালোই ঠেক্‌ছে তাতে—

বাইরে ভর সন্ধ্যের খ'দ্দেরের দল হাঁকাহাঁকি করে ফিরে গেল। কেউ কেউ এক কথায়, কেউ গাল খেয়ে। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধ'রে সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

ছেলেটা প্রথমে বিন্দির চেহারা দেখে তার কাছে আসতে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে কি জানি কি-ভাবে ঠাণ্ডা হয়েছিল। এইবার বিন্দির কোলের ভিতর থেকে মুখ বার করে বলল, মা' কাচে যাব।

উঠে ব'সে, তাকে কোলে বসিয়ে বিন্দি বলল, যেয়ো। ওরা খুব মেরেছিল না? কৈ দেকি?

শিশু মাথায় হাত দিয়ে বলল, মেরেচে।

মাথায় চুমো খেয়ে হাত বুলোতে বুলোতে দাঁতী বলল, বাছা রে! খিদে পেয়েছে মানিক?

ছেলেটি ঘাড় কাৎ করে বলল, খাব। দুধ খাব না জিলিপি খাব।

—জিলিপি? আচ্চা! দিচ্চি এনে···কমলা নেবু খাবে?

আঙুল চুষতে চুষতে ছেলেটি বলল, হুঁ।

ঘরের কোনায় একটা কাগজের ঠোঙায় দু'টো নেবু ছিল। এনে ছেলেটির দু'হাতে দিয়ে বিন্দি বলল, খুলে দেব! দিই?

—হুঁ।

লেবুর খোসা ছাড়িয়ে দিতে দিতে বিন্দির দু'চোখ হঠাৎ জলে ভ'রে এল। একটু পরেই চোয়ালের উঁচু হাড়টা বেয়ে টস্‌টস্ ক'রে জলের ফোঁটা ছেলেটার হাতে এসে পড়ল।

ছেলেটা মাথা উঁচু ক'রে দেখে, লেবু ভক্ষণে ক্ষান্ত হয়ে বলল, ছি! কানে না—

একটা অস্ফুট আওয়াজ ক'রে মুখ ঢেকে বিন্দি হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

ছেলেটি বিব্রতভাবে তার দিকে তাকিয়ে কমলা লেবুতে মন দিল।

খানিক পরে চোখ মুছে বিন্দি উঠে বসল। তার মনে হ'ল একটু পরই ত' খোকাকে পিসীর ওখানে দিয়ে আসতে হবে। কি করবে ওরা ওকে নিয়ে! কিন্তু···পিসী যে বলেছিল যাদের ছেলে তাদের ফিরিয়ে দে' আসবে···সত্যি? মনে ত' হয় না···এত সহজে—

আস্তানার দস্তুর বিন্দির অজানা ছিল না। ছেলেটাকে হয় বেচে দেবে, আর যদি রাখে তবে হাত-পা খোঁড়া করে দিয়ে তাকে রোজগেরে করে তুলবে।

খানিক ভেবে-চিন্তে সে বলল, তোমার বাড়ি কোতা লক্ষ্মীটি—

সে বলল, বাড়ি যাব।

—যাবে বৈ কি। কি রকম বাড়ি? খুব বড়?

—এ—তো বড়। লাল বাড়ি—

—লাল রঙের বাড়ি? টেরাম গাড়ি যায় সামনে দিয়ে?

ট্রামের নাম শুনে খোকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, টাম যায়, রেল যায়, আমি টামে চড়ব—

ট্রামও যায় রেলও যায় শুনে বিন্দির একটু খটকা লাগল। সে বলল, রেলে চড়বে না? রেল গাড়িতে?

খোকা বল, ধ্যেৎ···তাতে বুঝি চড়া যায়। মাটি, কাদা, ময়লা থাকে—

বিন্দির মনে রাস্তাটার আঁচ আসতে লাগল। সে জানত বাঙ্গা বেশির ভাগ সময়ই শেয়ালদার দিকে ঘোরে। সে মনে মনে একটা মতলব এঁচে বলল, খোকনমণি, তুমি বোসো একটু, আমি জিলিপি কিনে ফিরে আসি কেমন? কেঁদোনা?

জিলিপির নামে খোকন মাথা নেড়ে বলল, জিলিপি খাব। কানব না।

—আচ্ছা। বিন্দি বেরিয়ে ঝাঁপ এঁটে দিয়ে আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জিলিপি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হতে লাগল, কি করা যায়। ওরা যাই করুক, খোকার অনিষ্টই করবে। নিজের কাছে ওকে রাখবার জন্যে তার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাহ'লে ত' খেঁদির হাত এড়ানো যাবে না। তবে—

খোকার কথায় যদ্দূর বোঝা গেল, তাদের বাড়ি সারকুলার রোডে। কিন্তু কোন্‌খানটায় ঠিক বোঝা গেল না। না যাক্‌, ছেলে হারিয়েছে, তারাও কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই, এতক্ষণ শোরগোল পড়ে গেছে। খোঁজ করলেই সন্ধান পাওয়া যাবে।

আস্তানায় ঢুকে মনে হ'ল, এধার ওধার ঘুরে দেখে আসা ভালো, যদি কেউ থাকে।

রাত হয়ে গেছে। সমর্থ যারা, তারা রাতের রোজগারে বেরিয়েছে। খেঁদির ঘরে সব চুপচাপ···মাগী বোধহয় ঘুমুচ্চে। এ-সে-ঘর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা ঘুমন্ত গোঙানি, ও ছোটখাট ফিস্‌ফাস শোনা যাচ্ছে।

আড্ডা প্রান্তের পুব-দুয়ারী ঘরটা থেকে রতনার মত্তজড়িত তর্জন ও স্ত্রী কণ্ঠের অস্পষ্ট ফোঁপানি ছাড়া আর বড় কিছু কানে আসছে না।

সন্ধ্যের আগে ক্ষান্তর খুন-খুনে হাবাটা পটল তুলেছিল। লাশটা ঘরের সামনে পাঁকের মধ্যে টেনে ফেলে দেয়া হয়েছে, সময় বুঝে কাল যা হয় করা যাবে।

দেখে শুনে বিন্দি নিজের ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে আঁতকে উঠল।

—মাইরি, কে বাবা আঁদারে ঘুট্‌ঘুট্ করে বেড়াচ্চ? কে, বিন্দি?

—ওঃ! মড়া তুই!

নিজের ঘরের দাওয়ার ব'সে বাঞ্ছারাম আ-প্রাণ চেষ্টায় লম্বা কলকেটাতে দম কষছিল, বিন্দিকে দেখে বলল, আয়, আয়—

বিন্দি বলল, একন না, কাজ আচে।

—রাতদুকুরে কি কাজ বাবা! আজ কদ্দিন মাইরি—

—সে কি রে ড্যাকরা, এই না পরশুই—

—সত্যি ভুল হয়ে গেচে মাইরি! তা আজকে···বলে বাঞ্ছা একটা ইঙ্গিত করল।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিন্দি বলল, এয়ার্কি রাক, নইলে—

—কি বাবা! ধম্মোভাব কদ্দিন থেকে?

—যদ্দিন থেকেই হোক, তোর তা দিয়ে কাজ! বিন্দি ঘরের দিকে চলল।

বাঞ্ছা পেছন থেকে হাঁক দিল, বিন্দি, ছোঁড়াটা কোতা র‍্যা?

—পিসির ঘবে। ঘুমুচ্চে।

—দু'টোর ঘন্টি শুনেচিস গির্জের ঘড়িতে?

—খানিক আগে বারোটা বাজল।

—ওঃ তবে একনো বহুত টাইম আচে।

কলকেটা উপুড় করে রেখে, বাঞ্ছারাম সেইখানেই হাতে মাথা রেখে কাৎ হয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পর, খেঁদি আর বাঞ্ছা এসে বিন্দির ঘরের সামনে দাঁড়াল। খেঁদি কর্কশ চাপা গলায় ডাকল, বিন্দি···ওলো দাঁতী! মর মাগী·· ঘুমোলি নাকি?

—নিশ্চয় আয়েস করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে গড়ানো হচ্চে। ঢং দেখে আর বাঁচিনে! যত অনাছিষ্টি—

বাঞ্ছা ঝাঁপে ধাক্কা দিয়ে হুমকে উঠল, ওঠ শালী!

ধাক্কার চোটে ঝাঁপটা খুলে গেল।

খেঁদি বলল, যা ত' বাঞ্ছা, নে' আয় মাগীর চুলের মুটি ধ'রে।

আঁধার ঘরে ঢুকে, হাতড়ে হাতড়ে খানিক ঘুরে বাঞ্ছা বলল, ঘর খালি পিসি, কেউ নেই!

—অ্যাঁ, সে কি রে! ব'লে খেঁদিও গিয়ে ঘরে উঠল।

সত্যি ঘর খালি। জিনিসপত্তর যা ছিল ঠিক আছে। মানুষটি নেই।

বাঞ্ছা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, গেল কোতা তাহ'লে! এই ত' খানিক আগে দেখনু কোত্থেকে এসে ঘরে ঢুকল। ডাকনু, বললে কাজ আচে। ছোঁড়াটার কথা সুধোতে বললে, তোর কাচে, ঘুমুচ্চে!

—কি বললে? আমার কাচে!

—হ্যাঁ।

—সেই যে নে' এল, তা'পর ত' আমার ছায়াও মাড়ায়নি মাগী। যত নষ্টামি! নিশ্চয় ভেগেচে ওকে নে'—

—ভাগবে কোতা? আর ক্যানই বা ভাগবে? ছোঁড়াটার গায়ে ত' আর কিছু ছেল না!

—তা না থাক! মাগীর রকম-সকম একটুও ভালো ঠেকচে না আমার! কি ফ্যাসাদেই যে পড়নু—

—ফ্যাসাদ, না কচু! কিন্তু, ছোঁড়াটা নেহাতই যে বাচ্চা! পিরিত-ফিরিতের—

—গাঁজার দমটা চড়েচে বুঝি? যা তা বকিসনি, একন কি করবি, তাই ছ্যাক!

—করা আবার কি! এ তল্লাটে যদি খোঁজ মেলে ত' দেকে আসি!

—ছ্যাক, আমার কিন্তু বাপু রকম-সকম সুবিধের ঠেকচে না!

—তকুনি বলেছিনু তোকে, তা তুই ত' আমার কতা শুনবিনে! তখন না ছেড়ে দিলেই হতো!

পরদিন দুপুরে বাঞ্ছা এসে খবর দিল, শুনেচিস পিসি কাণ্ডটা! দাঁতী মাগী ছোঁড়াটাকে নে' ফেরত দিতে গেচল তাদের বাড়িতে, তারা তাকে পুলিসে দিয়েচে—

খেঁদি কপালে চোখ তুলে বলল, উপায়! এইবারে ত' দলশুদ্ধ ফাঁসাবে—

বাঞ্ছা একগাল হেসে বলল, কচু! তু' ঘাবড়াসনি পিসি, মাগী বোকার হদ্দ। আমি খবর নে' এনু, ও দলের কতা কিচুই ফাঁস করেনি। বলেচে ছোঁড়াটাকে পতে কানতে দেকে ও কোলে নে' বাড়ি পৌঁচে দিতে গেচল! তারা তা মানবে কেন? ওদের বাড়ির ঝিটা বললে, হার চুরির জন্যে মাগীর জেল হবে!

কথাটা শেষ ক'রে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে উঠল।

খেঁদিপিসীর পটলডাঙার দল যখন পথে ভিক্ষে করতে বেরুতো, তখন দলে একটিও পুরুষ থাকতো না বটে, কিন্তু তাদের আস্তানার অন্ধকূপগুলির বাসিন্দা শুধু ওই মেয়ে কটিই ছিল না। দু'একজনের ঘর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দুটি-একটি ক'রে পুরুষ থাকতো। পথে বেরুনো ছাড়াও তাদের অন্য রোজগার ছিল। রাত-বিরেতে পকেটকাটা অথবা ছোটখাটো চুরিচামারি করা, অবশ্য এসব আয়ের কথা প্রায়ই দলে ফাঁস হতো না। মোড়ল তাদের খেঁদি।

চঞ্চু থাকতো ক্ষ্যান্তর ঘরে। বিশেষ যে কোন সম্পর্ক ছিল, তা নয়। বছর চারেক আগে সে ক্ষ্যান্তর ভাই-পো পরিচয় দিয়ে এসে দলে ভর্তি হয়। ক্ষ্যান্ত, খেঁদির ডানহাত কাজেই খেঁদির বিশেষ ইচ্ছে না থাকলেও ক্ষ্যান্তর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তাকে নিয়ে নেয়।

পটলডাঙার পুরুষগুলো নাম করা। ও-তল্লাটে অমন বদমাইশ, হৃদয়হীন জানোয়ার আর কোনো দলেই ছিল না। দলের সেরা লোক ওই চঞ্চু। সে না পারতো এমন কাজই নেই। তার এই গুণের জন্যেই খেঁদি তার ওপর খুশি ছিল। তা না হলে এতদিন তাকে পথ দেখতে হতো।

একবার সে বাইরে রাত কাটাতে গিয়ে ভিন-দলের এক মেয়ের কান কেটে নিয়ে এসেছিলো। মেয়েটা নাকি তার কি এক প্রস্তাবে আপত্তি করেছিলো, তাই। আর একবার পথে একটা ছোট ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার চোখ দুটো আঙুলে টিপে গেলে দিয়েছিলো। পটলা স্বচক্ষে দেখে এসে খবর দেয়।

এহেন চঞ্চু যখন একদিন ময়লা, রোগা ও বোবা এক ছুঁড়িকে নিয়ে এসে দলে ভর্তি ক'রে নেবার সুপারিস করতে লাগলো, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। ছুঁড়ি দেখতেও এমন কিছু নয়, আর তার

সাথে চঞ্চুর ভাবের কথাও আগে কিছু জানা যায়নি। কোথায় যে তার দরদ ঠাহর করতে না পেরে সবাই অস্থির হয়ে উঠলো।

ছুঁড়ি তো ভর্তি হয়ে গেল। রোজ সবায়ের সাথে সাথে বেরোয়। ক্ষ্যান্তর ঘরখানা ছিলো বড়, সেই ঘরে সে থাকে, চঞ্চু তার খবরদারি করে। অন্য কোনো পুরুষের সাথে মিশতে দেয় না। সে নিজেও কাজে বেরুনো অনেক কমিয়ে দিলে।

হরিমতীর ঘরের রতন একদিন তাকে বললো, কোত্থেকে এক বেটীকে জুটিয়েচিস চঞ্চু, তুই যে ব'য়ে গেলি!

চঞ্চু তার কথায় কান না দিয়ে বললো, জ্বালাস্ নে রতনা, নিজের কাজ দেকগে যা!

—বাবাঃ, এযে কেউটে সাপ! ফোঁস ক'রে তো এলি, আসল ব্যাপারটা কি বল্ দিকি! বলি, বাঁধিয়ে বসেচিস কিছু? কিন্তু তুই তো সে পাত্তর নোস! অমন কত বাঁধিয়েচিস্, কিন্তু নিজে তো কখনো এমন বেঁধে পড়িসনি!

চঞ্চু তাকে ধমক দিয়ে বললো, চুপ্ রে হতভাগা! আমি যা করি, না করি—তোর তাতে কি রে? ফের যদি যা-তা বলবি অমন তবে,—জানিস তো চঞ্চুকে—

রতন বিলক্ষণই জানতো, আর তাই না ঘাঁটিয়ে সরে পড়লো।

সে সরে পড়লো বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই চাপা পড়লো না। চঞ্চুর আর আগের মতো ফুর্তি নেই। পথে বেরুনো তো ছেড়েছেই, রাতবিরেতে রোজগারও আর করতে চায় না। দিন-রাত ঘরে ব'সে থাকে। ছুঁড়ি ফিরে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাত বারটা-একটায় ফেরে।

এসব খেঁদির চোখ এড়ায়নি। সে মুখ বুজেই ছিলো। একদিন ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, আর চুপ করে থাকা চললো না।

সন্ধ্যেবেলা পটলা এসে বললে যে, সে রোজগারের মতলবে

ঘুরছিল। একটা মেয়ের হাতের বালার ওপর তার নজর ছিলো। বালাটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার একটা আঙুল মুচড়ে ভেঙে দেয়। চঞ্চু কোত্থেকে দেখতে পেয়ে এসে তাকে ঠাস্‌ঠাস্‌ ক'রে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছে।

খবর শুনে দলের স্ত্রী-পুরুষ সবাই খাপ্পা হয়ে উঠলো। সকলে মিলে খেঁদিকে ধরে পড়লো, এর একটা বিহিত কিন্তু তোকে আজই ক'রতে হবে পিসি। নইলে সব যে যেতে বসেচে। ড্যাকরার যে কি হ'য়েচে ক'দিন থেকে—সাধুগিরি ফলাতে শুরু করেচে।

খেঁদি কারো থেকে কম চটেনি। চঞ্চু ফেরা মাত্র সবাই তাকে নিয়ে পড়লো।

—বল্‌ মুকপোড়া, তুই ভেবেছিস্‌ কি? দলের নাম ডোবাতে বসেচিস যে।

চঞ্চু কোনো জবাব দিলো না।

একজন বললো, আগে ও তো আর এমোন ছেল না। ওই শুঁট্‌কি মাগী এসেই তো ওকে বিগড়েচে! ওকে না তাড়ালে চঞ্চুকে ফেরাতে পারবি না—

খেঁদি বললো, সত্যি ক'রে বল তুই, ও-মাগী তোর কে? আমি কেন, দশজনে দেকচে, ও-ই তোকে মারছে! ও কে তোর?

চঞ্চু মুখ তুলে দেখলো, সেও এসেচে। তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রে বললো, ও আমার বোন!

দলের মধ্যে দু'জনা পট্‌পট্‌ মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য হ'তো না। বোন? খেঁদির দলে বোন? মা-বোনের ছোঁয়াচ ঢের দিনই এড়িয়ে আসা গেছে!

খেঁদি বললো, কোতা পেলি তুই ওকে?

চঞ্চু বললো, রোজগারের মতলবে শেয়ালদা গেছনু। এক কোনায় ও হাত পেতে দাঁড়িয়েছেল। এক ভদ্দর নোক ওর হাতে একটা পয়সা দিয়ে গেল। তাই দেকে বেলেঘাটার মানুকে এসে

সেটা তুলে নিয়ে ছুট মারতে যেতেই ধাক্কা খেয়ে ও পড়ে গেল। কি তাজ্জব হলুম দেকে যে, একবারও কাৎরালো না। এগিয়ে এনু—দেকি যে দু' চোক দিয়ে জল পড়চে—কিন্তু মুকে রা'টি নেই। সন্দ হ'ল, বোবা নাকি? শেষে দেখনু তাই। সাথে ক'রে নে' ভিড় কেটে বেরিয়ে এনু। তা-'ও কি আসে? চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝনু—আমায় বিশ্বাস করচে না। বলনু আমায় সন্দ ক'রো না, আমি তোমার ভাই! ও খানিক ভেবে আমার সাথে চলে এলো। তা'পর এনে দলে ঢুকিয়ে দিইচি।

—কিন্তু তুই দিনকে দিন অমন ম্যাদামারা হ'য়ে যাচ্চিস্ ক্যানে—রোজগেরে বেরোস না যে আজকাল?

—ভালো লাগে না।

রতন তাড়ি খেয়ে এসেছিল। হাতে তখনো গাঁজার কল্কে। একধার থেকে টেনে যাচ্ছিল। চঞ্চুর জবাব শুনে কল্কে নামিয়ে বললে, কি বাবা সোনার চান্, ভালো লাগে না? বাবা, পিরিত বাঁধিয়েছ, সে কথা বললেই হয়?—আচ্চা সত্যি ক'রে বল্ দিকি, কি রস তুই পেলি ওর মধ্যে—

রতনের মুখের কথা মুখেই রইলো। চঞ্চু তড়াক ক'রে এক লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর প'ড়ে দোহাত্তা কিল-চড় মেরে যেতে লাগলো।

—মুখ সামলে কথা কইতে জানিসনি শুয়ার—বলবি আর—বলবি—বলবি—

সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু রতনের আর বসবার অবস্থা ছিলো না। ভুঁয়ে প'ড়ে গড়াতে লাগলো।

খেঁদি অবাক হয়ে দেখছিল। তারই চোখের ওপর চঞ্চুর যে এতটা সাহস হবে, তা' সে ভাবে নি। হোক না চঞ্চু দলের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড় সবচেয়ে নামজাদা। তা' বলে মোড়ল তো সে-ই।

খেঁদি বললো, শোন্ চঞ্চু, এই তোকে বলচি, ও মাগীকে তোর

ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েচিস কাল নে' সেই-খানে রেখে আসবি, নইলে—

চঞ্চু খেঁদির দিকে তাকালো।

—নইলে তোকেও দল ছাড়তে হবে। আগেকার মতো যদি হতে পারিস্, তবে ঢুকতে পাবি, নইলে আর নয়। বুঝেচিস?

চঞ্চু চুপ করে শুনলো। হাঁ-না কিছুই বললো না। খানিক পরে বোবা মেয়েটার হাত ধরে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

যে যার নিজের গর্তে ঢুকে পড়ল।

ভোর রাতের আবছা আলোয় দু'টি লোক খেঁদির আস্তানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

সকালবেলা চঞ্চু আর সেই ছুঁড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেদিন গেল, তার পরদিন,—তারপর অমন কতদিন চলে গেল, কিন্তু তাদের কোন হদিস্ আর মিললো না।

রতন টিপ্পনী কাটলো, বলেছিনু কিনা। শক্ত একটা কিছু বেঁধেচে বাবা। নইলে চঞ্চুর মতো স্যায়না ঘাগী—

॥ রাতবিরেতে ॥

শীতের শেষরাত।

বড় রাস্তার ওপর মস্ত তেতলা বাড়ি। অনেক জায়গা-জমি চারিধারে, প্রকাণ্ড ফটক। লতাপাতার ঝোপঝাড়ে দেয়াল-ঢাকা।

বাড়ির বেশির ভাগটাই অন্ধকার। বারান্দায় দু' একটা আলো জ্বলছে। তেতলার একটা জানলা থেকে খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে জমাট কুয়াশার জালে আটকা পড়ে থেমে গেছে।

ওপরের বারান্দা দিয়ে বার দুই একটা নার্স হেঁটে গেল। মাঝে মাঝে রোগাতুর কণ্ঠের দু'একটা কাতরানি আর মেথর জমাদারের ফিস্‌ফাস ছাড়া কোন সাড়াশব্দ নেই।

রাস্তা নির্জন, নিস্তব্ধ। দূরের একটা বাড়ি হতে থেকে থেকে ঘুমন্ত ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বড় বাড়িটার পাশেই ছোট্ট একটা গলি। গলির মুখটা বড় রাস্তার গ্যাস বাতির আলোয় আলোকিত, ভেতরটা বেজায় অন্ধকার। তেতলা বাড়িটার জঙলা দেওয়ালের মধ্যে ছোট্ট একটা দরজা গলির ওপর। লতাপাতাগুলো এমন ঝুলে পড়েছে যে চট্‌ ক'রে নজরে পড়ে না। দরজা খুলে আপাদমস্তক কালো চাদরে মুড়িদেওয়া আয়া-শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে ডাকল, ঝুমন—

অন্ধকার গলির সবচেয়ে আঁধার কোণ থেকে সাড়া এল, কে, সুখিয়া—

সাড়া পেয়ে সুখিয়া রাস্তায় নামল।

দু'জনে মিলে গলির ভেতরে খানিকটা এগিয়ে গেল।

সুখিয়া বলল, তোর আসতে এত দেরি হ'ল যে আজ? আমি দু'বার এসে ঘুরে গেচি আগে।

ঝুমন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, পতে এক শালা পুলিসের পাল্লায় পড়ে গেছনু! শালা কি সহজে ছাড়ে? অনেক ভজিয়ে-টজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে আসতে দেরি হয়ে গেল।—বাপ! যা শীত পড়েচে আজ!

ছেঁড়া কাঁথাখানা দিয়ে বেশ ক'রে কান মাথা ঢেকে নিয়ে বলল, নে' মাল বার কর।

সুখিয়া চাদরের ভেতর থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করল। ঝুমন হাত পেতে ধরতেই সেটা নড়ে উঠল। ভেতর থেকে একটা অস্ফুট শব্দ হ'ল ওঞা-ওঞা—

ঝুমন সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে বলল, কদ্দিনের?

—একটা দিন ষোল, আর একটা এক মাস।

—মেয়ে না ছেলে?

—ছু'টোই মেয়ে।

ঝুমনের বীভৎস কুৎসিত মুখখানা সেই অন্ধকারের মধ্যে সুখের হাসিতে ভ'রে উঠল।

সুখিয়া বলল, দু'খানা লোটের কমে এ জোড়া ছাড়চিনে!

—থাম মাগী! দু'খানা লোট! আমার ছ-ছ'টা করকরে টাকা লোকসান! এ জোড়ায় বারোখানা টাকা পাবি—মাদি ব'লে বলচি, মদ্দা হলে অদ্দেক দিয়েও পুছতুম না।

—মরে গেল, সে কি আমার কসুর? কুড়িদিনের অতবড় ছ্যানা, তু' বাঁচাতে পারলি নে, তা আমি কি করব? এর আগে ত' কখনো মরেনি আর! সেগুলোতে কত রোজগার করেচিস ভাব দিকি?—না, না, এ জোড়া নিতে হলে বিশ রুপেয়া ফ্যাল, তা'পর নে যা!

একটা শেষটান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে ঝুমন বলল, বিশ রুপেয়া কিছুতেই পারব না। আচ্ছা, বারোতে না ছাড়িস, সাত সাত চোদ্দ—

ব'লে সে গ্যাঁজে হাত দিল।

সুখিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলল, তাহ'লে পনেরটা দে। সিসটারকে আবার পাঁচ টাকা দিতে হবে এর থেকে, আমার থাকল ছাই!

—জবরদস্তি ক'রে একটা টাকা বেশি নিবি?—নে! কিন্তু আগাম হপ্তায় ভাল মাল চাই—মেয়ে। ছোঁড়া অনেকগুলো হয়ে গেচে, ও আর চাইনে। মেয়ে দিবি। আর বেশ পুরুষ্টু হয় যেন।

—খালি মেয়ে হ'লে আগাম হপ্তায় হবে না—পরের হপ্তায়।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই। কিন্তু মদ্দা বাচ্চা আর চাইনে।

—সে মেয়েগুলো পার করেচিস?

কোন্‌গুলো? ওঃ—হ্যাঁ। কুসমি নিয়েচে। বেটি চিপ্পুসের হাড়। বরাবর ওকে তাজা মাল জোগাচ্চি, কিন্তু বেটি শকুনি! এই ত' সেদিন পটলীকে পার করলুম, ন' বছরের অমন ডবকা মেয়ে'—বেটি দিতে চায় কিনা চল্লিশ টাকা। বললুম, মাসী, পথ দ্যাক্। ওকে ক্ষ্যান্তর কাছে ছাড়ব, ষাট টাকায় লুপে নেবে। অনেক ধস্তাধস্তির পর বায়ান্ন টাকায় রফা হ'ল।

—এত পাস, আর আমাদের সাতেই যত ছোট মান্‌ষী?

—ছোট মান্‌ষী! তোদের বেশি দাম দোব কোন্ সাহসে? যদি ম'রে যায়? আর আমার ত' নে গিয়ে পুষবার খরচ আচে! পাঁচ ছ'দিনের ছা' নিয়ে গে' ন'দশ বছরেরটি করতে হ'লে খাওয়াতে পরাতে কি কম খরচটা হয়? তার ওপর সব ক'টা কিছু দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হলে দামও কমে যায়। কতকগুলোকে আবার ঘরে বসিয়েই হিল্লে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষ-মেষ আমার ত' থাকে কচু! আর ছোঁড়াগুলো ত' বাজে খরচ! খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করি—চোক ফুটলেই নিজের পত দ্যাকে—

—তার মানে? গোড়ায়ই খাম করে দিস্‌না সেগুলোকে?

—সবগুলোকে নয়। যেগুলো দিই, তাদের কাচ থেকে অবিশ্যি কিছু আদায় হয়। সেই লালচুলো বাচ্চাটার কতা মনে আছে তোর?

সেটাকে হাত মুচড়ে কোমরের সাতে বেঁধে দিইছিনু। দিব্যি নুলো হয়ে গেচে এখন, পতে বসে, রোজগারও মন্দ হয় না।

—সে সায়েবের ছা'টার কি করেচিস ?

—সেটার জিব কেটে দিইছিনু—কি জানি ব্যাটাচ্ছেলে বড় হয়ে যদি সায়েবি বুলি ঝাড়তে শুরু করে! এখন সেটা খুব রোজগেরে হয়েচে, তবে আমায় বড় একটা মানতে চায় না।

—তা হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় ? সবাই যে তোর বশ হবে এমন ধরা-বাঁধা কতা কিছু নেই !

কথা বলতে বলতে দু'জনে ছোট দরজার কাছে এগিয়ে এল।

সুখিয়া বলল, বিড়ি দে একটা—

—এই ধর। ঝুমন সুখিয়ার হাতে বিড়িটা দিয়ে শিশু দু'টিকে বেশ ক'রে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে নিল।

একখানা ফিটন এসে থামল গলির মুখে। আরোহী দু'টি ফিরিঙ্গী যুবক। একজন চিৎ হয়ে প'ড়ে মত্তকণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজছিল।

ফিটন দেখেই সুখিয়া দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল।

ঝুমন বলল, গেলি না যে বড় ?

সুখিয়া তার মুখে হাত দিয়ে বলল, চুপ্।

ঝুলেপড়া লতাপাতাগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে একজন নার্স এসে গলিতে নামল। দু' একবার শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হন্‌হন্ করে গাড়ির দিকে চলল।

ঝুমন কি বলতে যাচ্ছিল, সুখিয়া তার হাত টিপল।

নার্স গাড়ির পা-দানে পা দিতেই একজন যুবক তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিল।

মাতালটা গাড়োয়ানকে বলল, এই-য়ো—চালাও।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে দু'একটা চুম্বনের আওয়াজ ভেসে এল।

গাড়ি চলে গেল।

সুখিয়া বলল, সিস্টারকে নিয়ে দিনকতক দেদার মজা লুটচে ছোঁড়া দু'টো।

ঝুমন জবাব দিল না। কাঁথাখানা আর একবার ভালো ক'রে জড়িয়ে সে বলল, আজ চললুম সুখিয়া—

—আয়।

গলি থেকে বেরিয়ে ঝুমন বড় রাস্তা ধ'রে কিছুদূর চলল। সামনে একটা কনস্টেবল দেখে সে পাশে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-গলি সে-গলি ক'রে সে শহরের এক প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখান দিয়ে একটা খাল চলে গেছে। সে সন্তর্পণে খালটা পার হয়ে, আরো কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি একটা সরু জমির ফালির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘোর অন্ধকার। দু'ধার দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মেটে কুঁড়ে। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। শীতকালেও সে জায়গাটা কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে।

খানিকটা গিয়ে মোড় ঘুরতেই, সে দেখল, একজন ভদ্রগোছের মানুষ র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চোরের মতো চলেছে।

সে দাঁড়াল, ডাকল, কি চান বাবু হেতায়?

ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল।

সামনের কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। বলল, কে ও? সর্দার! যেতে দাও, বাবু ময়নার কাছে এয়েছিলো!

—বিড়ি আচে ঘরে? দেত' একটা, ব'লে সে দুয়োরে পা দিতেই স্ত্রীলোকটি বলল, ঘরে ঢুকো না সর্দার, মানুষ আচে।

ঝুমন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে স্ত্রীলোকটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল। বলল, ভুঁদির ঘরে।

ঝুমন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আস্তানার মধ্যে হঠাৎ এত বাবুর আমদানি করলি কোত্থেকে খেঁদি?

খেঁদি বলল, বাবুর আবার অভাব! ঘণ্টা দু'তিন আগে ওই হোতা

বড় রাস্তার মোড়ে বাবু দু'টি আস্তানার দিকে তাকিয়ে ঘোরা-ফেরা করছিল। ভুঁদি গিয়ে কতা কোয়ে নিয়ে এসেচে।

—এটা যে পাড়া নয়, তা জানে ত' ?

—তা আর জানে না ! কত জিজ্ঞেসবাদ করলে। কে-কে থাকে হেতা, দিনের বেলা কি করে, এই সব। আমি বলি কি সর্দার, বাড়িউলি মাসীদের কাচে ছুঁড়িগুলো না বেচে, এখেনেই কেন ব্যবসা নাগিয়ে দাও না ! আমি বলচি তোমায়, বাবুর অভাব হবে না।

—না, না, তু' পাগলি হলি না কি ? আর দ্যাক, একটু সাবধানে কাজ করিস। এখন শোন্, ইদিকে আয়।

ঝুমন খেঁদিকে সাথে করে নিজের কুঁড়েয় নিয়ে গেল।

ঝাঁপ খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, এই দ্যাক, আজকের সওদা !

শিশু দু'টি দেখে খেঁদি বলল, কত নিলে ?

—পনের।

—ঠকায়নি। বেঁচে বর্তে থাকলে চার কুড়ি টাকায় এক-একটা বিকোবে !

ঝুমন শিশু দু'টিকে ঢেকে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শোয়াল।

তু' একটু খবরদারি করিস। আমি আসচি।—ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল।

ভুঁদির ঘরে শব্দ শুনে তাকাতেই, সে দেখতে পেল, দিব্যি ফিটফাট এক যুবক কুঁড়েঘর থেকে বেরুল। সেদিকে আর না চেয়ে সে নিজের পথ ধরল।

চারিদিক একটু একটু ক'রে ফরসা হয়ে আসছে। ঝন্‌ঝন্ শব্দ করতে করতে ময়লা-ফেলা গাড়িগুলো বড় রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করছে।

পেছনের কুঁড়েটা থেকে ছোট্ট ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে—ওঞা—ওঞা !

॥ ভুখাভগবান ॥

সারা বিকেল ঘর আর বার ক'রে, সন্ধ্যের মহড়ায় ফতিমা কুঁড়ের সামনের রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল।

দুপুরবেলা জমিদারের প্যায়দা এসে বাকী খাজনার দায়ে স্বামী কালু সেখকে ধরে নিয়ে গেছে। ফতিমা জানত, খাজনার কোনও সুরাহাই হবে না। কোত্থেকে হবে? গেল বছর দারুণ খরায় ছোট্ট জমির ফালিটাতে একদানা শস্যও জন্মায় নি, এ বছর ত' দেশ-জোড়া আকাল, পেটে দেবার দু'মুঠোই জোটে না—খাজনা ত' পরের কথা।

আজ তিন দিন দু'জনার ঠায় উপোসে কাটছে। খিদের দুশ্চিন্তায় আধমরা স্বামীকে তার যখন যমদূতের মতো পাইক এসে পাকড়াও করে নিয়ে গেল, ফলাফল সম্বন্ধে তখন থেকেই সে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। তাই সারা বিকেল তার আর উদ্বেগের সীমা ছিল না।

রাস্তায় এসে বহুক্ষণ বসে থেকেও কালুর ফেরবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আরো কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক চেয়ে হয়রান হয়ে ফতিমা ঘরে ঢুকে ছেঁড়া মাদুরটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নির্বাক চোখের জলে তার দু'গাল ভেসে যাচ্ছিল।

বাইরে রাতের স্থির অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির একঘেয়ে সারিগান ছাপিয়ে শেয়ালের দল চেঁচাতে লাগল। মিনিট কয়েক তারস্বরে চেঁচিয়ে তারাও থেমে গেল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠে ব'সে, চট্ ক'রে চোখ মুছে, দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। ফতিমা বলল, কে?

কেউ জবাব দিল না।

ফতিমা আবার বলল, কে?

এবারো জবাব না পেয়ে সে একটু অবাক হয়েই ঘরে ঢুকে কেরোসিনের ডিবেটা বার করে এনে জ্বালাল। আলোতে উঠোনটা ভালো করে দেখে সে আবার ঘরে ঢুকে ঝাঁপটা টেনে দিল।

কিসের না কিসের শব্দ,—একথা বেশিক্ষণ তার মনেও রইল না।

একলা ঘরে বসে তার মনে হতে লাগল, স্বামী এলে কি খেতে দেবে তাকে। ঘরে কিছুই নেই। তৈজসপত্রও এমন কিছু নেই, যা বাঁধা দিলে একটা পয়সা পাওয়া যায়। বন থেকে ভোরবেলা এক কোঁচড় বৈঁচি ফল তুলে এনেছিল ; তারই গোটাকয়েক অবশিষ্ট ছিল। খিদেয় তার নিজেরো সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছিল। ভারী লোভ হচ্ছিল ছু'টো ফল মুখে দিয়ে চিবুতে—কিন্তু অভুক্ত স্বামীর কথা মনে পড়াতে হাত উঠল না। ঘরের কোণে মেটে কলসীতে জল ছিল, ঢকঢক ক'রে তাই খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে সে ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল।

সেইখানে বসে তার মনে হতে লাগল স্বামীর কথা। সে দোষী, খাজনা দিতে পারেনি তাও ঠিক, কিন্তু খাজনা দেবার মতো অবস্থা যে তাদের নয়, একথাটা কেউ বোঝে না কেন। আজ বছর-খানেক প্রায় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে চলছে। সে মেয়েমানুষ হয়ে এতটা বুঝছে আর মুলুকের রাজাবাবুর ঘটে কি ছাই এটুকু বুদ্ধিও নেই!

কতক্ষণ সে সেখানে বসেছিল ঠাহর নেই, চমক ভাঙল হঠাৎ খুব কাছেই পায়ের শব্দ শুনে। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল দাওয়ার এক প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গা-টা একটু ছমছম করতে লাগল। সে বলল, কে দাঁড়িয়ে হোতা?

যে দাঁড়িয়ে ছিল কোনো কথাই কইল না।

হঠাৎ পেছনে থেকে আচমকা আর একজন এসে একহাতে তার মুখ আর একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরল। এক লহমার জন্য সে অভিভূত হয়ে পড়ল, বাধা দেবার শক্তি রইল না।

আততায়ী তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যে লোকটা আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, সেও হাত ধরল।

উনিশ বছরের জোয়ান মেয়ে ফতিমা, একটা মানুষের সাথে লড়বার তাগদ খুবই ছিল। কিন্তু দু'জনের মিলিত পশুশক্তির কাছে তার জোর কোনই কাজে এল না।

তিন দিনের অনাহারী, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত, কাহিল মেয়েটির সমস্ত বাধা ও আপত্তি রক্তমাংসের খিদের আগুনের মুখে নেহাত খড়কুটোর মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আধ ঘণ্টাখানেক পর যখন স-ইয়ার জমিদার-পুত্র চলে গেলেন, ফতিমা হুঁশ হারিয়েছে তখন।

দিকব্যাপী নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানহীনা ধর্ষিতা নারীর বুকটা সমান তালে কেঁপে যেতে লাগল।

কালু যখন ফিরল, অনেক রাত হয়ে গেছে তখন।

কম্পিত পদে দাওয়ায় উঠেই সে ডাকল, ফতি,—অ ফতি—

কেউ জবাব দিল না। ঘরে নেই ভেবে কালু একটু এগোতেই নজরে পড়ল ঝাঁপ খোলা। সে একটু অবাক হ'ল : ঘর খোলা—অথচ ফতি নেই···! হয়ত কাছেই কোথাও গেছে···পানিটানি আনতে, কিংবা অমনি একটা কিছু। একবার মনে হ'ল পুকুরধারটা ঘুরে আসে, কিন্তু কাছারীবাড়ির আপ্যায়িতের তাড়নায় সমস্ত শরীর তখনো অবসন্ন, পা আর চলছিল না। যেখানেই থাক, এখনি আসবে ভেবে সে ঘরে ঢুকল।

দু'পা যেতেই পায়ে কি ঠেকে সে চমকে উঠল। ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে গিয়ে ফতিমার হাতখানা হাতে বাধল। সে আস্তে আস্তে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিল মানুষটি কে। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকল, ফতি, ফতিমা—

ফতিমা সাড়া দিল না।

কালু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে আঁধারে হাতড়ে পথে কুড়িয়ে

পাওয়া একটুকরো মোমবাতি খুঁজে বার করে জ্বালিয়ে ফেলল। তারপর তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে এসে বসতে যেতেই চোখ পড়ল দরজার কাছে কাগজের মতো কি একটা জিনিস। সে সেটা কুড়িয়ে এনে বাতির কাছে ধরল।

পাঁচটাকার নোট! কালু আকাশ পাতাল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। নোটখানা সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে সে স্ত্রীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে বসল।

কিছুক্ষণ বাদে ফতিমা চোখ খুলে বলল, কে···স্যাথ এলি?

হঠাৎ কি একটা মনে পড়তেই সে অস্ফুট শব্দ ক'রে সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসল।

কালু ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, ফতি কি হয়েচে তোর? অমন করচিস ক্যানে? অসুক করেনি ত'?

জবাব না দিয়ে ফতিমা কালুর মুখের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মুক্তিতে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। সে অস্পষ্টস্বরে বলল, তোর গায়ে ও কিসের দাগ? রক্তের না?—ব'লে সে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

কালু দু'হাতে ফতিমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার দু'চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে বড় বড় ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল।

ফতিমা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, শুয়ে পড় তুই, আমি বাতাস করে দিই। পানি দোব? এই দিচ্চি। আমার জন্যে মন বেজার করে থাকিস নে ত? কি হয়েচে আমার?

সে স্বামীর অজ্ঞাতে চোখ মুছে কলসী থেকে জল গড়িয়ে ফল ক'টি এনে স্বামীর সামনে ধরল।

কালু টপাটপ ফল ক'টা মুখে ফেলে ঢকঢক ক'রে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তুই? তুই খেলিনে কিছু?

ফতিমা ম্লান হেসে বলল, আমার খাওয়া হয়ে গেচে।

ছেঁড়া মাদুরটার ওপর গা ঢেলে দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া

কাঁথাখানা গায়ে টেনে কালু বলল, কাল থেকে তোকে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না ফতি! কি পেয়েচি গ্যাক্—

সে খুঁট থেকে নোটখানা বার করল।

—কি করে এল খোদা জানে! কিন্তু এয়েচে যখন, তখন একে হেনস্তা করলে খোদা খুশী হবে না। দু'টো জীব উপোসে মরচে দেখে তিনিই পাইয়ে দিয়েচেন হয়ত!

নোট দেখে ফতিমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক লহমায় তার সন্ধ্যের কথা সব মনে পড়ে গেল। তার দু'চোখ ছাপিয়ে জল ছুটল—অনেক চেষ্টা করেও সে থামাতে পারল না।

কালু অবাক হয়ে ফতিমার মুখের দিকে তাকাল। এই দুর্দিনে টাকার আমদানিতে খুশির বদলে চোখের জলের মানে সে মাথা খুঁড়েও বুঝে উঠতে পারল না।

—কাঁদতে লাগ্‌লি ক্যানে রে? হোলো কি?

ফতিমা দুই হাতে মুখ ঢেকে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। সব শুনে কালু রুখে উঠে দাঁড়াল। নোটখানা কুঁচকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘরের কোণ থেকে ধারালো দা'টা হাতে করতেই ফতিমা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোথা যাবি তুই এই রেতে?

—পথ ছাড় ফতি! দীনদুঃখীর মা-বাপ নেই যে মুলুকে, সেথা হাতের জোরই জোর! সেই বেজন্মার মুণ্ডুটা যদি না আজ ধড় থেকে খসাতে পারি ত'—

—যেতে হবে না তোর, শুয়ে পড়।

ফতিমার দীন কণ্ঠস্বর শুনে কালু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,···ক্যানে পথ আটকাচ্ছিস তুই? ওরে, উপোস ক'রে কালু সেখের কব্জির জোর একরত্তিও কমেনি রে—সে এখনও দু'চারটা দুশমনের গর্দান নেবার তাগৎ রাখে—

—সে হোক, কিন্তু তাই ব'লে এত রেতে তুই যাবি সেই বাঘের

মুখে? একা কি করবি ওদের অতগুলোর সাথে? তার ওপর জমিদার বাড়িতে গুলি বারুদের কারবার? তার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড় এখন, কাল বিহানে যা খুশী করিস!

উত্তেজনার মুখে কালু অত কিছু ভেবে দেখেনি। তার ওপর নিজের যে শক্তিটুকু ছিল শরীরে আজকের নির্যাতনে তাও কাবার হয়ে গেছে। সে অবসন্ন হয়ে আবার শুয়ে পড়ল। বলল, তুইও শুবি আয়।

—হেথায়ই শুচ্চি আমি, তুই ঘুমো।

—ওসব বুঝিনে আমি, শুনতেও চাইনে! তুই কি একটুও খাটো হয়ে গেচিস আমার কাছে যে ওরকম করে বলবি? তুই আয়—

—আমার মন যে মানচে না। আজকের রাতটা যেতে দে না হয়—

কালু আর কিছু বলল না। ক্লান্তি আর ঘুমে তার চোখ ভেঙে আসছিল।

রাতের বিনিদ্র অবস্থার মধ্যে ফতিমার শুধু এই কথাই বারে বারে মনে হতে লাগল যে, এরপর আর সহজভাবে স্বামীর সাথে বাস করা চলবে কিনা। শরীরের ওপর অত্যাচার ত' শুধু দেহটার ওপর দিয়েই যায় নি, মনেও যে গভীর ক্ষতের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে গেছে। তাই যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিবিবেচনা, সবার ওপর দিয়েই অবুঝ মন কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল: না, না···আর হয় না—আর হয় না—

কান্নার বেগ সামলে নিয়ে সে আবার ভাবতে বসল: আচ্ছা, বেশ! কিন্তু তারপর? কদিন ত' ঠায় উপোস চলচে···আর ক'দিন একা হ'লে হয়ত কালু চালিয়ে নেবে, সে থেকেই ত' বিপদ বাধিয়েছে। আজকের নির্যাতনের মূল কারণও যে সে-ই, এ সম্বন্ধে ফতিমার কোন সংশয় ছিল না।

ফতিমা ভাবল: আচ্ছা, সে যদি মরে, তবে কি হয়! সব দিক দিয়েই ভালো হয় না? সে বেঁচে থাকলে তাকে নিয়েই জমিদারের

সঙ্গে দাঙ্গা বাধবে আর তার ফলাফল এত সুনিশ্চিত যে, ফতিমা শিউরে উঠল। না। বেঁচে থেকে সে অনেক দাগা দিয়ে গেল স্বামীকে···

অজ্ঞাতে ছ'চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে চোখের জল মুছে সে উঠে বসল।

নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিক অনেকক্ষণ সজল অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে ঝাঁপ খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশের এক কোণে শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছিল।

ভোর রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গিয়ে কালু যখন উঠে বসল, পেটের আগুনে তার বত্রিশ নাড়ী হজম হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

সে ডাকল, ফতি—

সাড়া না পেয়ে সে তাকিয়ে দেখল—ফতিমা নেই উঠে দাওয়ায় এসে জোরে ডাকল, ফতি—

দাওয়ার ওপর রাতের সেই নোটখানা কোঁচকানো অবস্থায় পড়েছিল। সেটার দিকে ছ' একবার তাকিয়ে সে ডাকল, ফতি—

এবারেও কোন সাড়া না পেয়ে সে ভাবল, ফতিমা নিশ্চয়ই পাশের বাদাড়টায় ফল-পাকড়ের সন্ধানে গেছে। মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, সে ডোবার দিকে চলল হাত মুখ ধুতে।

ছোট্ট পানাপুকুর। ধার থেকে একটা পিটুলী গাছ জল ছুঁয়ে নুয়ে পড়েছে। তারি তলায় পানার মধ্যে কি একটা ভাসছিল। একটু নিপুণভাবে তাকাতেই ফতিমার ছেঁড়া ডুরেটার মতো খানিকটা কাপড় কালুর নজরে পড়ল।

বিদ্যুৎশিখা যেমন ক'রে আকাশের বুক চিরে ঝলসে যায়, কালুর

মাথার মধ্যে একটা আশঙ্কা তেমনি মুহূর্তে খেলে গেল। সে রুদ্ধ-নিশ্বাসে পিটুলী গাছটার দিকে ছুটল।

ফতিমার মৃতদেহটা পাঁজাকোলা করে এনে কালু দাওয়ার ওপর রাখল। চোখ তার শুকনো—অসম্ভব রকম রাঙা। হাঁটুর ওপর ফতিমার মুখটা তুলে সে আচ্ছন্নের মত বসে র'ইল।

অভিভূত ভাব কেটে গিয়ে যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন রোদ উঠেছে, আর সমস্ত শরীর উত্তেজনায়, অবসাদে, শোকে, খিদেয় ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

আর একবার ফতিমার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে, সে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কম্পিত পদে দাওয়ায় পড়া নোটখানা তুলে নিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশে ছুটল।

॥ দুর্যোগ ॥

দোতলা ডেকের রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চাদ্‌গামী জলধারার ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, কখন যে সারাদিনের ডানপিটে দুরন্ত হাওয়া আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে দম বন্ধ ক'রে একেবারে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, টেরও পাইনি।

সচল ও অচল রঙ-বেরঙের পোঁটলা-পুঁটলি সমেত একজন মাঝ-বয়সী যাত্রীর কথায় চমক ভাঙল। লোকটি পানের রসে লাল টকটকে মুখ-বিবর থেকে এক-হাঁ ধোঁয়া ছেড়ে বলল···গোতিক বর সুবিদার না জোগন্নাথ, ঝোড় বিষ্টি আইব মনে লয়।—বুচি লো! চুন দে দেহি এট্টু—

শতরঞ্জির ওপর হুঁকো ও গামছা-বাঁধা জলতরঙ্গ টিনের তোরঙ্গে ঠেস দিয়ে আজানু গোলাপী পাঞ্জাবি ও তদুপরি নীল স্ট্রাইপ দেওয়া টুইলের গল্‌ফ কোট গায়ে একটি বছর সাতাশ-আটাশের মদনমোহন শুয়েছিল। বোধকরি তারই নাম জগন্নাথ। সে চট ক'রে কপালের লতায়িত কেশগুচ্ছের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ডাইল! হালার আপনার যত গাঁজাখুরি কথা! হুদাহুদি ঝোড় আইব ক্যান? আর আহেই যদি হালার ডর কিয়ের? আমরা ত' আর হালার জাইলা ডিঙ্গিতে য্যাইতাছি না!

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হ'ল ঝড় আসা বিচিত্র নয়। সমস্ত আকাশের রঙ পাংশু—পিঙ্গল, ঈশান কি নৈঋ´ত, কি একটা কোণে হিংস্র শ্বাপদের মতো একরাশ ঘোর কালো মেঘ শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তের মতই ওঁৎ পেতে বসেছে। তীরে গাছের পাতা স্পন্দহীন, কেবল স্টীমারের আশপাশ ঘুরে গাঙচিলের ওড়ার আর বিরাম নেই। চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থম্‌থম্ করছে।

প্রকৃতির আসন্ন তাণ্ডবের আশঙ্কা যাত্রীদলের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে গেছে। সবার মুখেই একটা সংহত উদ্বেগের আভাস। আমার মন্দ লাগছিল না। দেখাই যাক। মাঝ পদ্মায় ঝড়ের কথা শুনেছি ঢের, পড়েওছি; কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি, 'জান্ পহচান'টা এবার যদি হয়েই যায়, মন্দ কি ?

একজন ইজের-পরা মাল্লা যাচ্ছিল। শুধোলাম, কিহে বাপু, ঝড়-টড় হবে নাকি ?

উত্তরে সে কালিমাখা হাত নেড়ে ও দাড়ির আড়ালে একগাল হেসে, দুর্বোধ্য চাটগাঁয়ে ভাষায় যা' বললে, তার অর্থবোধ দূরের কথা, মর্মগ্রহণ করতেই আমার হ'য়ে এল। কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে মনে হ'ল সে বলছে, তা হ'লেও হ'তে পারে। এখন ত' তুফানেরই সময়। তবে ডর নাই।

—ভয়-ডরের কথা নয়, আদপেই ঝড় হবে কিনা, তাই শুধোচ্ছি।

খালাসী সায়েব চলতে শুরু করেছিল, কথার জবাব দিল না।

কিন্তু জবাব পেতেও দেরি হ'ল না, যদিও পেলাম একটু নতুন রকমে। খানিক আগের স্থির-অচঞ্চল প্রকৃতিকে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল, পিছু পিছু বড় বড় ফোঁটার চড়বড় শব্দে নহবৎ শুরু হ'ল।

যাত্রীদের চাঞ্চল্য কোলাহলে গিয়ে পৌঁছুলো। কানাত নামানো, শতরঞ্জি গুটানো, বাক্স প্যাঁটরা সামাল ও তারি সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের সব ক'টা জেলার ভাষায় সমস্বরে চীৎকার,—সে এক দৃশ্য! হঠাৎ চোখ পড়লো একটি লোক আমার পাশ কাটিয়ে ফিমেল কম্পার্টমেন্টের ধারে গিয়ে আপাদ-গ্রীবা শতরঞ্জি মুড়ি দিয়ে উবু হ'য়ে বসল। সন্তর্পণে একবার কপালের কেয়ারিতে হাত বুলোতেই চিনতে পারলাম, সে পূর্বোক্ত শ্রীমান জগন্নাথ। হাবভাবে বুঝলাম শ্রীমান ভীত হয়েছেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে

গেচে। আকাশ-কোণের শ্বাপদ জন্তুটা দেহ-বিস্তার ক'রে আকাশের অর্ধেকের বেশি গ্রাস করে ফেলেচে। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, থেকে থেকে চারদিক মৃদু আলোক-কম্পনে চম্‌কে চম্‌কে উঠচে। সে আলোয় ধূসর বৃষ্টিধারা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না, একটু গিয়েই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোঙরাতে থাকে, সমস্ত আকাশ জুড়ে তেমনি একটা শব্দ হচ্চে।

হঠাৎ তিমিরঘনরাত্রির সমস্ত আবরণ নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে একটা অতি তীব্র ঝাঁঝালো বিদ্যুচ্ছটা ঝলসে উঠল, নিমেষমধ্যে জলস্থল কাঁপানো বিকট বজ্র-নির্ঘোষে চরাচর স্তম্ভিত, মূক হয়ে গেল। মনে হ'ল যে প্রকাণ্ড আকাশটা ভেঙেচুরে নদীর বুকে এসে আছড়ে পড়ল।

ভয় পীড়াদায়ক সম্ভাবনার আতঙ্কে, পরিণতির মধ্যে ভয়—ভয়ানক নয়। তাই দৈত্যপুরীর সব ক'টা দানব যখন বাঁধনহারা উন্মত্ত-উল্লাসে একসাথে ঘাড়ে এসে পড়লো, তখন একটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া সাহসে মনটা ভ'রে উঠল।

ডেকের দিকে তাকিয়ে দেখি হাওয়ার স্টীমার কাত হয়ে গেচে। সমস্ত যাত্রী ঝড়ের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিচু দিকটায় গিয়ে জমায়েত হয়েচে। কোথায় কানাৎ, কোথায় কি! সব উড়চে। আবালবৃদ্ধবনিতার মিশ্র কলরব ছাপিয়ে দু'একজন মানবহিতৈষীর গলা পাওয়া যাচ্চে।

—যান, যান, আপন আপন জায়গায় যান! গাদি ক'রবেন না এক মুরায়,—দ্যাহেন না হালার জা'জ কাইত অইয়া গেছে—

উপদেশ শোনা ও তদনুসারে কাজ করার মতো স্থান ও কাল সেটা নয়, তাই নিজ নিজ জায়গার ওপর কারো বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল না, যিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তাঁরও না।

বাহিরে অষ্টদিকপালের মাতামাতি সমানে চলেচে। অবিরল বৃষ্টি, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ, আকাশের অশ্রান্ত সরব আস্ফালন, সমস্ত

ডুবিয়ে উন্মত্ত বায়ুর অধীর হুঙ্কার! তারই ভেতর দিয়ে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল 'বাজার্ড' স্টীমার, বায়ুতাড়িত হ'য়ে কোন এক ঝড়ের পাখির মতই সবেগে ছুটে চলেচে।

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন ডাকচে। কাকে, কে জানে! ওকি, আমাকেই—

—শুনুন, একবার এদিকে—

চেয়ে দেখি মেয়ে-কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ি-বাইশের একটি সাদাসিদে হিন্দুঘরের মেয়ে। আমি এগিয়ে যেতেই তিনি ব্যগ্রভাবে বললেন, অবি—অবিনাশবাবুকে ডেকে দেবেন একটু? অবিনাশ বোস। অনেকক্ষণ হ'ল নিচে গেচেন, ফেরেননি। তিনি আমার স্বামী।

তাঁর চোখের জল বোধহয় বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছল, কিন্তু গলার আওয়াজে টের পেলাম—তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম,—আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি ডাকচি তাঁকে।

তিনি সেইখানে দাঁড়িয়েই বললেন, আমি ঠিক আছি—আপনি যান।

—ভিড় ঠেলে নিচে নামতে নামতে মনে হ'ল, যে বিপদে গেরস্ত ঘরের বউ অসঙ্কোচে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ও একান্ত অজানা পরপুরুষের সাথে সপ্রতিভ কথা কয়, সে বিপদ আর যাই হোক—সামান্য নয়।

স্টীমার অসম্ভব দুলছিল। শুনলাম এঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েচে, হাওয়ার মুখে যে দিকে যায় যাক্। সারেঙ হাল ধরে বসে আচে।

উন্মত্তা এলোকেশী প্রকৃতির বিরামহীন তাণ্ডব থেকে থেকে আচমকা অট্টহাসিতে ভীষণতর হয়ে উঠচে।

ডেকের মথিত বিধ্বস্ত জন-সঙ্ঘের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ ক'রে নিয়ে অবিনাশবাবুর খোঁজ শুরু করলাম। স্টীমার দুলচে, পা ঠিক

রাখা শক্ত, তার ওপর ধাক্কা-ধাক্কি—একটা লোহার থামে ঠুকে গিয়ে খানিকটা জখম হ'ল কপালে।

বাধা ও বিফলতায় যে মরিয়া ভাবটার সৃষ্টি করে, সেটা উৎসাহ নয়, উন্মাদনা। অসাফল্যের লজ্জাকে বরদাস্ত করার লজ্জা, সে উন্মাদনার মুখে আমি কেন—কেউই মানতে রাজী নয়। তার ওপর দু'টি সিক্ত চোখের সনির্ভর মিনতি—সব রকম দুঃসাধ্য কাজেই তার জোরে হাত দেওয়া। গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়লাম,—অবিনাশবাবু অবিনাশবাবু—

যাত্রীদের আর্ত কোলাহলে আমার গলা ডুবে গেল। অবিনাশ-বাবুকে বার করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হ'ল না। আর সে ভদ্রলোকেরও বলিহারি যাই, পথে স্ত্রী সাথে করে বেরিয়ে এই দুর্যোগে বেমালুম তার কথা ভুলে বসে আছেন। একবার পেলে এক হাত নোব···

ডেক, সেলুন, হস্পিটাল, কোথাও তিনি নেই। চেঁচিয়ে গলা ধরে গেচে, জামাকাপড় ভিজে একাকার, কপালে রক্তের দাগ—তখনকার চেহারা সম্বন্ধে তখন কোন কথা মনে হয়নি এই রক্ষে। তবে অবস্থাটাও তখন খুব স্বাভাবিক ছিল না, এটা মানতে হবে।

এইবার নিচের পালা। সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর যেতেই একটা প্রবল দমকা ঝাপটে জাহাজ বাঁদিকে আরও কাত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেল, গেল,—সব গেল, ধরনের একটা মিশ্রিত কোলাহল, মিলিত কণ্ঠের অমন অসহায় করুণ আর্তনাদ আর কখনও শুনিনি। মুহূর্তের জন্যে হিমশিহরণে আমার সংজ্ঞা অসাড় হ'য়ে এল, মনে হ'ল পড়ে যাব।

ধীরে সামলে নিয়ে দৃঢ়পদে নিচে নেমে এলাম। নিচের দৃশ্য আরও ভীষণ। যেদিকে যাত্রীদল ভিড় করেছিল, সেদিকে বেশি জল ওঠায় সবাই মাঝামাঝি একটা জায়গায় জমে গেচে। আর খালাসী শ্রেণীর গুণ্ডা গোছের জন তিন চার লোক অকথ্য, অশ্রাব্য, গালাগাল

দিতে দিতে সেই কম্পমান, ভয়ার্ত মনুষ্যপিণ্ডের ওপর নির্বিচারে দোহাত্তা কীল চড় লাথি চালিয়ে যাচ্চে। তাদের বক্তব্য স্টীমার কাত হয়ে গেচে, জল উঠচে,—উল্টো দিকটায় যেতে হবে—নইলে বিপদ।

তাদের কথা যুক্তিহীন নয়, বৃষ্টি ও হাওয়ার তোড় তুচ্ছ ক'রে উঁচু দিকে যাওয়া উচিত, তাও বুঝলাম। কিন্তু যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়েচে, সেটা খুব সুষ্ঠু ঠেকল না। নেমে গিয়ে পেছন থেকে খালাসী ক'টার পিঠে তাদেরই প্রদর্শিত পথে মুষ্টি ও পদাঘাত করলাম। ভাগ্য ভাল, ভিড় থেকে দেখতে দেখতে জন দশ বারো এগিয়ে এসে আমার সাথে যোগ দিল।

মারামারিটা যখন জমে উঠেচে, তখন আমি টুক ক'রে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়লাম, অবিনাশবাবু, অ—অবিনাশবাবু—

এখানেও বোস মহাশয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

এঞ্জিন পেরিয়ে সামনে এলাম। সেখানে তেমন ভিড় নেই। ডাকঘরের কাঠের কুঠরীর আনাচে-কানাচে পার্শেলের মালপত্রের পাহাড়, খবরের কাগজ থেকে চিটে গুড়ের জালা পর্যন্ত সবরকম জিনিসই বর্তমান। একপাশে জন দশ বারো কুলি, পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই, জড়সড় হয়ে ঝড়ের ঝাপট থেকে শরীর বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করছে। দু'একজনের ছেঁড়া নোংরা কাঁথা আছে, তারা তাই মুড়ি দিয়ে বসে আছে। বেশির ভাগই নগ্নগাত্র, পরনে শুধু একটি নেংটি।

এইবার হতাশ হলাম। এখানে একটি ভদ্রলোকও নেই—কাজেই অবিনাশবাবুও যে নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবু মনে হ'ল, থাকতেও পারেন কোথাও গা আড়াল দিয়ে, দু'একটা ডাক দেওয়ায় দোষ নেই।

প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচালাম। আরো জোরে—আরও।

হঠাৎ মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে যেন আওয়াজ হচ্চে,—কে—কে? এই যে—আমি এখানে—

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু—কৈ? কেউ ত' চোখে পড়ে না! হাঁক ছাড়লাম,...কৈ মশায়? কোথায় আপনি, অ-অবিনাশবাবু—

একটু একাগ্রমনে লক্ষ্য করতেই মনে হ'ল মালের গাদির গভীরতম প্রদেশ হ'তে জবাব হ'ল, এই যে, বড় চ্যাঙাড়িটার তলায়...ডাইনে...

অবাক হ'য়ে পার্শেলের পাহাড়ে উঠলাম। চ্যাঙাড়ি—একটা নয়, অনেক। দুর্গন্ধে বুঝলাম, সুটকী মাছের। তার একটার তলায় বেশ একটু গর্ত মতো হয়েছে, তারই মধ্যে ঘাড় দাবিয়ে উবু হয়ে বসে বিপন্না অপরিচিতার স্বামী শ্রীঅবিনাশ বোস, পাশের একটি অর্ধনগ্ন জোয়ান কুলীমেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বোধকরি কাব্যচর্চা করছিলেন। আমাকে দেখে আমার দিকে বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, কি চান মশায়?

পত্নীকে দেখে পতি সম্বন্ধে যে গুটিকয়েক ধারণা খানিকক্ষণ থেকে পোষণ করছিলাম, বোস-জা'কে দেখে সেগুলি শশব্যস্তে পলায়ন করল। চেহারার বর্ণনা না করাই ভালো, কারণ অত কুৎসিত মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না। রঙটা ফর্সা এবং সেই জন্যেই আরো খারাপ লাগছে। পুরু পুরু কালো ঠোঁটের আনাচে কানাচে খেঁকি কুকুরের মতো শুঁয়ো শুঁয়ো চুল টিকটিক করচে। বয়েস মনে হ'ল পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

একটা ধাক্কা সামলে কঠিন গলায় বললাম, বেরিয়ে আসুন।

লোকটা হুকুমের ধরন শুনে ভয় পেল কিনা বুঝলাম না, দু'হাতে চ্যাঙাড়ি ভর দিয়ে বেশ ক্ষিপ্রতার সাথে তিড়িং করে এক লাফে অনেকটা দূরে এসে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে, সতৃষ্ণ নয়নে একবার পেছনে তাকিয়ে জিব চটকে বললে, কি বলচেন?

লোকটার হাবভাব দেখে বুঝলাম, স্ত্রীর বিরহটুকু সে ফাঁকা হা হুতাশে না কাটিয়ে একটা সদ্ব্যহারের পথ বার করে নিয়েচে।

—আপনারই নাম অবিনাশ বোস ?

—আজ্ঞে।

—আপনার স্ত্রী রয়েছেন ওপরের ফিমেল কেবিনে ?

লোকটা একটু ঘাবড়ে জবাব দিলে, হ, হাঁ। কেন, কি হয়েচে বলুন ত ? কিছু— ?

—ঘাবড়াবেন না। আপনার আক্কেলটা কি মশায় যে, এই দুর্যোগের সময় আপনি তাঁকে একা ফেলে দিব্যি এখানে রস-চর্চা করচেন ? আর ওদিকে তিনি—

আমাকে বাধা দিয়ে এইবার তিনি হুমকে উঠলেন। একজন অপরিচিত ছোকরা, প্রথমত স্ত্রীর হয়ে ওকালতি করতে এসেচে, এবং দ্বিতীয়ত একটি সঙ্গোপন রসানুভূতিতে ব্যাঘাত জন্মিয়েচে,—কাজেই চটবার কথা ত' বটেই ! বললেন, আপনি···ইয়ে, আমার স্ত্রী···ইয়ে, তোমার'অত মাথাব্যথা কেন হে ছোকরা ! আর ইয়ে, ভদ্দলোকের বোয়ের সাথে পরিচয়ই বা কর কোন্ এক্তারে ?

আমার হাসি পেল। চেপে সমান চ'টে বললাম, চোপ।

লোকটা মুহূর্তে গুড়িশুঁড়ি মেরে গেল।

—দায় ঠেকেচে আমার আপনার স্ত্রীর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ করতে! তিনি নিজে এসে আমায় প্রভুর খোঁজে পাঠিয়েচেন। অদর্শনে অধীর হয়ে···বুঝেচেন ?

অবিনাশবাবু নরমভাবেই বললেন, যেতে দিন মশায়, যেতে দিন। তাঁর ইয়ে, আমার স্ত্রীর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি ত' ? ওকি, আপনার কপাল কেটে গেচে যে ! ইয়ে, বড্ড রক্ত পড়চে !

কপালে হাত দিয়ে বললাম, ও কিছু নয়। আপনি চলুন তা'কে কথা দিয়ে এসেচি, আপনাকে নিয়ে যাব।

—চলুন, ব'লে একবার শেষ-মেষ সেই কুলি-মেয়েটার দিকে প্যাঁটপ্যাঁট করে চেয়ে তিনি আমার সাথ ধরলেন।

একটু যেতেই অবিনাশবাবু বললেন, তা' ইয়ে, আপনি ত' আর

লোক মন্দ নন! কিন্তু দেখুন দেখি, ইয়ে, ওঁর ব্যাভারটা! হুট্ করে এসে একজন ইয়ে, পরপুরুষদের সাতে কথা কওয়াটা কি ঠিক হয়েচে?

দেখলাম লোকটা অতিশয় ইতর, তখনো স্ত্রীর সাথে আমার কথা কওয়াটা হজম করতে পারচে না। সর্বাঙ্গ আমার রাগে রি-রি করতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল বলি, আপনার স্ত্রী ত' বিপন্না হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন আমার কাছে, কিন্তু মশাই কি খুব ধর্মভাবে ওই কুলি-মেয়েটাকে গো-গ্রাসে গিলছিলেন?

কিছু বললাম না।

বাইরে কি ভয়ানক অন্ধকার। ঝড় পূর্ণ বেগে চলেচে। ভিতরের সমস্ত সতর্কতা, কোলাহলকে তুচ্ছ ক'রে রুষ্ট প্রকৃতির তর্জন গর্জনের আর অন্ত নেই। বিদ্যুৎ থেকে থেকে চমকে উঠচে, দুর্যোগের নিবিড় তিমির,—সে ক্ষণপ্রভায় আরো ঘন, আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেচে। আকাশের গুরু গর্জন হাওয়ার উচ্ছৃঙ্খল হাহাকারের সঙ্গে মিশে অভিশপ্তা রাত্রিকে দ'লে ম'থে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলচে।

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন, তখুনি জানি ইয়ে, পেটে যখন বিদ্যে ঢুকেচে, তখন, ইয়ে, স্বভাবচরিত্তির ঠিক নেই। ডবকা বয়সটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, কিন্তু ইয়ে, এমন ভোগান্তি জানলে কোন্ শালা—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কি বলচেন আপনি? কার কথা বলচেন?

—আর কার কথা মশাই, গে'—আমার স্ত্রীর। দু'টো গুঁড়ো রেখে আগের বৌটা যখন মরল, ভাবলাম,—ধু-শালা, ইয়ে, আর ওসব দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু হারুখুড়ো মেয়ে দেখিয়েই ত' সব বিগড়ে দিলে! হত দরিদ্র মশাই, হত দরিদ্র! বাপটার না আচে চাল, না আচে চুলো! কিন্তু আবার ইয়ে, এদিক নেই ওদিক আচে! মেয়েকে ব্রেহ্ম ইস্কুলে পড়ানো হয়েচে? তখন কি ছাই

অত ভেবে দেখেচি! বয়স কুড়ি শুনেই আমার নোলায় জল এল! ইয়ে, এলাম ঘুরে সাত পাক! কিন্তু এখন—

রাগ আমার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোন মতে দমন করে বললাম, কি এখন? কি করেচেন তিনি?

লোকটার লালসা, নীচতা, এমন ইতর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল ওকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিই!

ভেঙচানো স্বরে জবাব হ'ল, না, করেননি কিছু। তবে নবেলী করে একজন বাইরের পুরুষের সাথে কথা কইলেন আজ,—কাল ইয়ে,—করবেন কি কে জানে! আমায় না দেখতে পেয়ে—অধীর।···ইয়ে, বিরহ··· ?

লোকটা চুমকুড়ি দিয়ে হেসে উঠল।

আমি আর সামলাতে পারলাম না। তড়িৎবেগে এক হাতে লোকটার ঘেঁটী চেপে আর এক হাত মুঠো ক'রে তার নাকের ওপর তুলতেই সে বাধা দিতে দিতে ওপাশে চেয়ে ব'লে উঠল, ইয়ে, ওকি···সতু · তুমি ··!

আমার হাত অসাড় হ'য়ে খসে এল।

চকিতবিদ্যুতালোকে দেখলাম, অবিনাশবাবুর স্ত্রী পাথরের মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। দু'ঠোঁট রক্তশূন্য—পাংশু!

আমি সেখান থেকে সরে এলাম।

ঝড়ের বেগ বোধহয় কমছে। বৃষ্টি ধরেচে, থেকে থেকে হুহু করে হাওয়া বইচে। নৈশ প্রকৃতি দুরন্ত ছেলের মতো দিনমানের ছুটোপুটির পর শ্রান্ত অবসাদে এলিয়ে পড়েচে। তার গা থেকে ডানপিটেমীর চিহ্ন মেলায়নি। কিন্তু ঠোঁটের কোণে কোনও উদ্বেগ নেই।

॥ স্বাহা ॥

কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সায়েব উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভারি চোখের পাতার কোণ থেকে বড় বড় ফোঁটা স্ফীত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। জানালার শার্সিতে হাত ভর দিয়ে, তারই মধ্যে মুখ গুঁজে সরকারের খেতাবী উজীর, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো দাস সায়েব ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। আবেগ-প্রাবল্যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো।

নিচে লাল সুরকির সরু রাস্তা ধরে ডাক্তারের টু-সীটার সশব্দে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে মিসেস দাসের গলা শোনা গেল, ওগো, তুমি এত অধীর হচ্চো কেন? যা গেচে, তা কি ফিরবে আর? আর কষ্ট কি তোমারই একার? আর কারো বুকে কি তোমার মতই লাগেনি? কথা শোন···এদিকে এস—

দাসের কাঁধে হাত রেখে মিসেস দাস কোমর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে, চোখ মুছে ও নাক ঝেড়ে, কপালে হাত দিয়ে চুল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললেন, এখনকার যা কাজ সে সম্বন্ধে তো উদাসীন থাকলে চলবে না। সোফারকে গাড়ি দিয়ে মার্কেটে পাঠিয়েচি ফুল আনতে, রতন নিচে ফোনে বসে আছে রাজ্যিশুদ্ধ লোকের শোকপ্রকাশের জবাব দিতে।

দাস সায়েব কাঁধ থেকে মিসেসের হাত নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়েই ক্লান্ত ধরা গলায় বললেন, আমায় মাপ করো লীলা, যা করবার তুমিই ক'রো, ওসব তুমিই ভালো বোঝ। আমি একটু একা থাকতে চাই।—ব'লে স্খলিত পায়ে তিনি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস মিনিটখানেক বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁধ

ঝাড়া দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন, মেয়ে তোমার শুধু একারই মরেনি, তাই বলে ঢঙ করতে শিখিনি আমরা। বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়, দু'ফোঁটা চোখের জল বেশি ফেললেই কি আর মরা মেয়ে ফিরে আসবে? যখনকার যা, তখনকার তা। মেয়ের শোকে এখনকার কর্তব্য ভুললে চলবে কেন?···দেখি কাদের ওখান থেকে আবার ফুল নিয়ে চিঠি এসেচে, জবাবটা লিখে দি'গে--

আর একবার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে তিনি দ্রুতপদে নিচে নেমে গেলেন।

ড্রইংরুমের দক্ষিণে লটির শোবার ঘর। একটা দরজা মাঝে, ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের সাথে পশ্চিমে স্নানের ঘর, পূবে চওড়া বারান্দা টবে ও অর্কিডে সাজানো। সে দিকে দু'টো দরজা। ঘরের ঠিক মাঝখানে চওড়া খাটটার ওপর আপাদমস্তক কাশ্মীরী চাদরে ঢাকা, তেইশের কোঠা না পেরতেই অচিন পথের দেওয়ানা, লটি দাস শুয়ে আছে। দু'একগাছা চুল বালিশের ওপর দিয়ে এসে এপাশে ওপাশে ঝুলছে। শোওয়ার ধরন-ধারণ এত স্বাভাবিক, যে দেখলে মনে হয় রোজ যেমন সে খাওয়ার পর একটা বই হাতে করে শুয়েই অমনি ঘুমিয়ে পড়তো, আজও তেমনি পড়েছে। মাথার দিকে আয়নার টেবিলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তেমনি সাজানো। আজ কেবল রুপোর চিরুনিটার দাঁতের ফাঁকে একগাছা চুলও বেধে নেই, আর টেবিলের চকচকে মেহগনিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।

লটির হাত দু'খানা বুকের ওপর, মাথাটা ডাইনে কাঁধের দিকে একটু হেলানো। চাদরের ভেতর দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মুখের চাদরটা উঠিয়ে ফেলতো, তবে দেখতে পেতো, লটির আজকের ঘুম প্রকাণ্ড প্রশান্তির ঘুম নয়। অল্প ফাঁক ঠোঁট দু'টিতে অতৃপ্তির প্রত্যাশা মাখানো। মুদিত চোখের কোণ বেয়ে যে অশ্রুধারা ছাপ রেখে গেছে, তার উৎস শুধু দৈহিক যন্ত্রণাই খুলে দেয়নি। নাকের ডগার যে লালিমাটুকু মরণ এখনো মুছে

নিতে পারেনি, তার পেছনে অনেক অমুক্ত বেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

লটি দাস···সোসাইটির নামকরা মেয়ে লটি! রূপে গুণে তার তুলনা ছিল না। যে পার্টিতে তার যাওয়া হত না, সেখানকার ছেলে বুড়ো সবাই মনমরা হয়ে উঠতো তার অভাবে। যে ডিনারে সে যোগ দিত না, সেখানকার প্রত্যেকটি ডিশ বিস্বাদ হয়ে উঠতো। তার একটি কথা রাখবার জন্যে দরকার হলে কেউ কেউ প্রাণ দিতে পারতো। ছোকরা ব্যারিস্টার সরকার বিলেত থেকে গোঁফের ধার ছেঁটে মর্কট সেজে এসেছিলো। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে বড় করে রাখতে অথবা কমিয়ে ফেলতে রাজি করাতে পারেনি। লটির একবার নাক সেঁটকানোর মর্জিতে সে-জোড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়েছিল। ষাট বছরের বুড়ো, পেনশানভোগী সিবিলিয়ান হালদার সায়েব, তাঁর তিরিশ বছরের মৌতাত, হাভানা শুদ্ধ লটিকে তুষ্ট করবার জন্যে ছেড়ে, সিগারেট ধরেছিলেন। সমাজে লটির প্রতিপত্তি ছিল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো।

ঘণ্টা দুই-আড়াই হ'ল লটির মৃত্যু হয়েছে, এরি মধ্যে ফোনে ও লোকের মারফত খোঁজখবরের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। একতলার হল-কামরা কালো পোশাকে ও ক্রেপে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সাদা ফুল লটির ঘরে আসছে, ঘর ভরে উঠলো বলে। সমাগত শোক প্রকাশকদের নিয়ে মিসেস দাসের ব্যস্ততার আর অবধি নেই। আদর, অভ্যর্থনা, ঘন ঘন শুকনো চোখে রেশমি রুমাল বুলোনো, 'মিস্টার দাসের হঠাৎ এই খানিক আগে শরীরটা—' বলে তাঁর হয়ে মাপ চাওয়া—অনবরত চলছে। অভ্যাগতদের মধ্যে কলকাতার বড় দরের কতিপয় ইংরেজ ও বহু বাঙালী সায়েব মেমের মধ্যে বিশেষ কেউ আর বাকি নেই। কেউ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে আছেন, কেউ মিসেস দাসকে দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলছেন—কেউ চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে লটির বিষয়ই আলোচনা করছেন।

যাঁরা আসতে পারেননি তাদের মধ্যেও লটির মৃত্যুসংবাদ কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। কেউ হয়তো হাইকোর্ট বেরোবার মুখে খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন, লটি, লটি দাস! এমন হঠাৎ—কেন, কি হয়েছিল তার! এমন শক্ত কিছু হয়েছে ব'লে তো আগে শুনিনি—

একটু একটু ক'রে তাঁর মাথায় সমস্ত স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠছে।

লটি আমায় দু'টো ফুল দিয়েছিল দে'র গার্ডেন পার্টিতে। দিন কয়েক পর আমি একটা ব্রোচ প্রেজেন্ট নিয়ে যেতে তার মুখ ভার,··· শেষে মায়ের তাড়ায় বেচারিকে রাজি হ'তে হ'ল। মিসেস সরকারের বুক্-টিতে সে way of an eagle হয়ে গেছল। প্রথম ধরি আমি —good gracious! ওকি বারোটা! ডি, সি-র সাথে একটা কনসলটেশন ছিল যে,—ঘড়িটা বেগড়ায়নি তো!···

সকাল প্রায় সাতটায় লটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরটা অসুস্থ ছিল ক'দিন থেকে, কাল সারাদিন ঘর থেকে বারই হয় নি। আজো সকালে চা খেয়েছে ঘরেই। খানিকক্ষণ পরে বাথরুমে গোঙানির শব্দ শুনে মিসেস দাস ছুটে গিয়ে দেখেন, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কি, আর কারো জানা না থাকলেও মিসেসের অজানা ছিল না। কিন্তু সে কথা তিনি যে জন্যেই হোক কাউকে বলা উচিত মনে করেননি। সেবা শুশ্রূষা ডাক্তার কিছুরই ত্রুটি হয়নি, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা গেল না, এমন কি যে মায়ের কথা সে জীবনে কোনদিন ঠেলেনি, তাঁর সহস্র কাতরোক্তিতেও না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, দাস সায়েবকে বলেও গেছেন। কিন্তু সেতো বাইরে বলা চলে না। মিসেস দাস সবায়ের প্রশ্নের জবাবে বলছেন, না। স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের কোনায়, ব্রেইন কঙ্কাশন, দু'ঘণ্টা পুরোও রাখা গেল না,—সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল।

মিসেস দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে। হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিল, শুধু মায়া-মমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাশন তাঁর সবটুকু জুড়ে ছিল। নিজে তিনি ছা-পোষা ঘরের মেয়ে। পঁচিশ বছর আগে যখন ডেপুটি নরেন দাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়, দাস তখন যাযাবর বৃত্তি ধরে বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

দাসের মতামত বরাবরই একটু সায়েবী। ওটা পৈতৃক উত্তরাধিকার, তাঁর বাবা রমেশ দত্তদের আমলের ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিলিতিয়ানায় তাঁকেও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হ'তো। মুখে কিছু বলা সম্ভব হ'ত না, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীর ধরণ-ধারণ অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

বিয়ের বছর তিনেক পর যখন লটি হ'লো, মিসেসের নবউন্মেষিত সভ্যতার চক্ষু গিয়ে তার ওপর পড়লো। স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে তিনি মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে পড়লেন। লটির বছর ন'য়েক বয়েসের সময় তিনি স্বামীর কর্মস্থল পিরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করে সকন্যা দার্জিলিং-এ সমারূঢ়া হলেন। উদ্দেশ্য স্থায়ী অবস্থান, উপলক্ষ্য মেয়ের শিক্ষা।

মায়ের নিপুণ তত্ত্বাবধানে মেয়ের পড়াশুনা ও তাঁর ফিরিঙ্গীয়ানা তড়িৎগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগলো। সতেরো বছর বয়সে লটি পিয়ার্সন ম্যাগাজিনে কবিতা ও ত্রিলোক মানে তিন্‌ঠো আদমী বলতে শিখলে।

কুড়ি বছর বয়সে তার পিয়ানো বাদন ও ইংরেজী অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জিলিং মেলে সাঁড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌছোলো।

এই সময় একদিন 'কলকাতা গেজেটে' খবর বেরোলো যে, দাস সাহেব অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা কলেকটরের পদে উন্নীত হয়ে আলিপুরে বদলি হয়েছেন।

কলকাতায় এসে প্রথম শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিশতে ডেপুটি জায়ায় যে অসুবিধে, মেয়ের দৌলতে মিসেস দাস তা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন! লটির খ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে হোমরা-চোমরা বাঙালি সায়েব-মেম মহলের সব দরজাই তাঁর জন্য উন্মুক্ত হতে লাগতো।

লোয়ার সারকুলার রোডের এক ফ্ল্যাটে দাস সায়েব বাসা নিয়েছিলেন। আসবাবপত্র এলো পার্ক স্ট্রীটের বিলিতি দোকান থেকে, মোটরও এলো একখানা—ফোর্ড। মোটর নিয়ে সায়েব মেমে প্রথম দিনই বচসা হয়ে গেল। মিসেস বললেন, আমি হেঁটে বেড়াবো সেও ভালো, কিন্তু তোমার কলের টমটমে চড়তে পারব না।

দাস ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, বেশ তো! বয়স হলে হাঁটার মতো ভালো জিনিস কি আর আছে?

মিসেস ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন, মল্লিক সায়েবের মেম ডেমলার কিনলে সেদিন, তারাও তো আর ক্যাশ সব টাকা দেয়নি!

—সত্যি কথা। মল্লিক নগদ দেয়নি, কিন্তু দেবে। অর্থাৎ দিতে পারবে। কারণ মাস গেলে সে বেতন পায় সাতাশশো, আর আমার? হপ্তা খানেকও হয়নি, সাড়ে আটশোর কোটা পেরিয়ে বারোশো পঁচাত্তরে ঠেকেচে।

জবাবে মিসেস দুর্বোধ্যভাবে যা-তা বলে উঠে গেলেন।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওই ফোর্ডগাড়ি, কলকাতার সবচেয়ে দামী গাড়ি হয়ে উঠলো। ওই গাড়িতে লটির পাশে একটু বসবার জায়গা পেলে, বহুৎ রোল্‌স মিনার্ভা-র মালিকও নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। দেখে শুনে, মিসেস দাস হেঁটে বেড়ানোর শুভ সংকল্প ত্যাগ করলেন।

সোসাইটি পুরোমাত্রায় চলতে লাগলো।

দিন কতক পর একদিন রাতে শুতে যাবার আগে দাস সায়েব মিসেসকে বললেন, ছাখো, মল্লিকের ছেলের সাথে লটির বেশি মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।

মিসেস ভ্রূ কপালে তুলে বললেন, কে, টুটু? The finest young man in society! তেরো বছর বিলেতে ছিল পাব্লিক স্কুল আর—

—আমি জানি। একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেচে, তাও জানি।

—কে বললে তোমায়? নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেচে। ওগো, ঘটে যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকতো, তবে তুমি এসব ভাবতেও না। অমন বাপমায়ের ছেলে, জুনিয়ারদের মধ্যে পসারও হয়েচে মন্দ নয়। কে কোথায় কি কানে তুলেচে, তাই তাকে cut করতে হবে?

স্ত্রীর দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাস বললেন, শোনো লীলা, অতো কথা আমি শুনতেও চাইনি, বুঝতেও চাইনে। I don't want Mullick Jr. to get thick with Lottie, ব্যস্।

তিনি বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

মিসেস কিছুক্ষণ হতস্তম্ভ হয়ে বসে রইলেন। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলেন, ইস! ভা-রি-তো!

মুখে বললেন বটে, ইস্, কিন্তু স্বামীকে তিনি চিনতেন। বেশী কথার মানুষ তিনি নন, গায়ে পড়ে বড় কিছু বলতেও আসেন না। আজকের পর প্রকাশ্যভাবে টুটুর সাথে মেলামেশা যে তিনি বরদাস্ত করবেন না—এ সুনিশ্চিত। কিন্তু তা বলে তাঁর নিজেরও তো একটা মতামত আছে। মেয়ের ওপর দাবি কি শুধু একা বাপেরই! স্বামীর কথামত চললে সোসাইটিতে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে যে। মল্লিকবাড়িতে তো ঢোকাই যাবে না—ছিঃ!

এমন সময় লটির গলা শোনা গেল, মাম্,—মাম্—তোমার চিঠি, নেলিদের ওখান থেকে—

—ইয়েস ডিয়ার, বলে মিসেস উঠে গেলেন।

পরদিন বিকেলে সার এস. এন. দত্তের ফটকের সামনে দাসের ফোর্ড এসে দাঁড়াতেই ইজেরকোর্তার তবকজোড়া কতিপয় ইয়ং মেন এগিয়ে এসে মিসেস ও মিস দাসকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুড়ে ফেলে টুটু মল্লিক বললে, by jove, Baby, you are late! ঝাড়া একঘণ্টা আমরা তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। Couldn't you come earlier?

মৃদু হেসে লটি বললে, না ড্যাডির অ াস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হলো আজ. তাই—

—Hell! চলো, মিসেস দাস এগিয়ে গেছেন।

টুটু একটা সিগারেট বার করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠুক্তে লাগলো।

মল্লিক জুনিয়ারকে লটি যে খুব পছন্দ করতো, তা নয়। কিন্তু মনের অপছন্দকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার মতো সাহসও তার ছিল না, শিক্ষাও হয়নি। টুটুর ধরণ-ধারণ ক'দিন থেকে একটু কেমন কেমন ঠেকলেও সে কিছু গায়ে মাখেনি। চলতে চলতে টুটু বললে, কি হবে এখুনি ওই বুড়োদের দলে ভিড়ে? চলো, একটু বেড়ানো যাক বাগানের দিকে।

লটি বললে, কিন্তু মাম্ miss করবে আমাকে—

—আশ্চর্য! তুমি কি কচি খুকী রয়েচ এখনো? মা-র আঁচল ধরে ঘুরতে হবে।

—তা নয়। তবে কারো সাথে দেখা হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—

—কি হবে দেখা করে? ওখানে গেলেই তো ভায়োলেট মিত্তিরের ক্যাটকেটে গলার সুর ভাঁজা, না হয়, রেণু চৌধুরীর damned Bengali songs শুনতে হবে।

—বাঙলা গান আমার খুব ভালো লাগে।

—কবে থেকে? সেদিন পর্যন্ত তো দেখেছি, বাঙলা তুমি ভালো বোঝই না—

—তারপর শিখচি।

অপ্রসন্ন মুখে টুটু বললে, বেশ, চলো তাহলে।

দু'জনে গিয়ে ড্রইংরুমে উঠলো।

লেডি দত্ত লটির হাত ধরে বললেন, বড্ড দেরি হলো লটি, তোমাদের। এসো এ ঘরে, কিছু মুখে দেবে চলো।

গৃহকর্ত্রীর কথা শুনে অভ্যাগতদের জনকয়েক কিচিরমিচির করে উঠলো, oh dear, no! Don't rob us of her company!

হালদার সায়েব পাকা ভুরু জোড়ার ওপর প্যাঁসনেটা বসিয়ে বললেন, তা হলে বিভা, খাবারটাই এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এসো গো, মা লক্ষ্মী, এইখানে এসো, বলে তিনি হাত ধরে লটিকে নিজের পাশে বসালেন।

লটি বসে, অল্প হেসে বললে, আজো খেয়েছেন ওগুলো!

একটু বিব্রত হয়ে অপরাধীর মতো হালদার বললেন, খুব কম মা, খুব কম। তিরিশ বছরের মৌতাত—তা আজ সমস্ত দিনে মাত্র ছ'টা খেয়েচি।

লটি বললে, বারে বেশ তো! আমি কি আপনাকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিতে বলেচি? কমাতে কমাতে ছেড়ে দেবেন।

হালদার আশ্বস্ত হয়ে লটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মা লক্ষ্মী! তারপর শুধোলেন, দাস এলো না যে?

মিত্র সায়েবের মেমের সাথে মিসেস দাস পর্দার কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে বচসা করছিলেন হালদার সায়েবের কথা কানে যাবামাত্র বলে উঠলেন, তাঁর মাথাটা বড় ধরেছে আজ, তাই আর বেরোতে পারলেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে লটি পিয়ানোর পাশে রেণু চৌধুরীর কাছে উঠে গেল।

বাইরে, বাগানের ধারের বারান্দায় টুটু মল্লিক ও ভায়োলেট মিত্তির সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিল।

আধপোড়া সিগারেটটা ছেড়ে ফেলে ভায়োলেট বললে, Horrid! গাঁজা।

মল্লিক বললে, sorry! my brand—

—I know, but not mine বলে, ভায়োলেট আংটা আঁটা রেশমী ব্যাগ খুলে সুদৃশ্য ছোট সোনার কেস বার করে খুলে ধরে বললে, try?

একটা তুলে, নিজের নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে, লম্বা একটান দিয়ে টুটু বললে, ঘাস খেলেই পারো!

—খাইনে বলেই তোমাকে চিনেছি। তারপর what about your latest?

কপালে চোখ তুলে টুটু বললে, মানে?

—ন্যাকা, কিছু বোঝ না, না? ওসব আমার কাছে নয়। I am—

—কি বাজে বক্‌চো ভায়োলেট।

—আমি বাজে বক্‌চি? খ্যাপা কুকুরের মতো লটি দাসের পাছ নিয়েচ, শুধু আমি কেন, a host of others watching! চোখ এড়ানো এতই সোজা!

—I say, Vi আস্তে, আস্তে, তুমি বড্ড চেঁচিয়ে কথা কও।

—Fiddlestick! What do I care? সবাই জানুক, সেই তো আমি চাই। তুমি যে কি চিজ—

—আহা চটো কেন? কি করতে চাও তুমি, আমায় ফাঁসাবে? সে তুমি পারবে না, তাহলে সাথে সাথে নিজেকেও ফাঁসতে হবে এবং তোমার রাঁচির মীনা মাসী—, কথা শেষ না করে টুটু রেলিংয়ে বসে দেয়ালে ঠেস দিলে।

ভায়োলেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, ও!—That's what you are banking on? ভাল করেচ মল্লিক জুনিয়র, মেয়েদের তুমি চেননি। নিজে আমি যাই করে থাকি না কেন, to save

that innocent kid's honour, I can risk my own—এই মুহূর্তে I shall warn Lottie এই বলে যাচ্ছি তোমাকে, আমার কথা বাদ দাও,—আমি old sport, আর সবার কথা? যারা জানে, তারা সবাই জানে—

একটু বিব্রত হয়ে টুটু বললে, don't be silly, Violet! হেল্লো এই যে সরকার, এসো এসো! ওকি তোমার গোঁফ কোথায় গেলো? দেখেচ ভায়োলেট—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বললে, বাঁচলে এখনকার মতো। তারপর সরকারের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি জানি। আর কেন কামিয়েচে তাও জানি।

আমতা আমতা করে সরকার বললে, হেঃ, কি জানেন আপনি? আমার খুশি আমি কামিয়েচি!

ভায়োলেট বললে, বটে, ডাকবো লটিকে?

মুখ চুন করে সরকার ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগলো।

মল্লিক বললে, কেন ওকে ঘাঁটাচ্চো সরকার। তারচেয়ে চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসা যাক। শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেচে। যাবে নাকি ভায়োলেট?—I refuse to drink with you.

গলা ভিজিয়ে সরকার আর মল্লিক যখন ফিরলো, তখন পিয়ানোতে লটি গাইছে। একপাশে পিয়ানোয় ঠেস দিয়ে ভায়োলেট একখানা বিলিতী স্বরলিপির পাতা ওল্টাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে লটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখ তাকিয়ে দেখবার মতো। যথেষ্ট হিংসার কারণ থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেট মনে মনে তারিফ না করে পারছিলো না।

লটির গান শেষ হবা মাত্র ঘন ঘন করতালির সাথেই সবাই thank you, thanks, বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মল্লিকজায়া বললেন, একখানা গেয়েই ফাঁকি দেবে? আর একটা হোক না—সেই *lovely lads of Ludlaw*—

লটি বললে, বাঃ, আমি তো খানিক আগেই আরো দু'খানা গেয়েছি। একা আমিই entertainment-এর ভার নেব নাকি? আর কারো গাওয়া উচিত—

মিসেস রায় বললেন, তা তো বটেই, বেচারী হয়রান হয়ে পড়েচে। তা' হলে ভায়োলেট, you're nearest the piano—

ভায়োলেট বললে, আমায় গাইতে বলার সেই বোধহয় একমাত্র কারণ? Of course I don't mind, বলে সে বসে পড়লো।

মিসেস রায় লজ্জিত হয়ে বললেন, না, না, তা কেন।

লটি উঠে হালদার বুড়োর পাশে এসে বসলো। বুড়োকে সে মনে মনে ভারী পছন্দ করতো, শ্রদ্ধাও করতো। শিশুর মতো সরল মানুষ। এই পরবেশী ও পরভাষী সমাজে তিনি যখন তাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন, তখন তার সত্যিই খুব ভালো লাগতো।

বসেই কব্জির দিকে তাকিয়ে লটি বললে, ঈস্, রাত যে অনেক—

—কটা?

—দশটা দশ।

—তাহলে একটু রাত হয়েচে বটে। কেমন লাগলো তোমার আজকের পার্টি?

—বেশ।

—বিভা ভারী ভালো মানুষ, না? একটু সেকেলে, তা আমাদের কাছে তাই ভালো লাগে। হালের চালচলন পছন্দ হয় না আমার, তবে বরদাস্ত করে যাই।

—তাহলে, আমাদেরও ভালো লাগে না আপনার?

—তুমি বড় কথা কাটো মা-লক্ষ্মী; আমি কি তাই বললুম? তবে এই আজকাল সবাই, এত ছোট সব জিনিস নিয়ে এরা থাকে, ভালো লাগে না। চালচলনও সব কেমন যেন! এই ধর না ইয়ং মল্লিক, well, to be frank, I detest the fellow!

টুটু মল্লিক একপাল মেয়ের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল। লটি সেদিকে তাকিয়ে দেখলে, হালদারের কথার জবাব দিলে না।

মিসেস দাস গৃহকর্তার সাথে দামি দামি মোটরের গল্প করছিলেন। লটি তাঁকে বললে, It's getting late, Mum—

—কেন কটা বেজেচে?

—Time we were gone! সাড়ে দশ।

সার এস. এন. বললেন, সেকি এখ্‌খুনি—?

মিসেস দাস বললেন, হ্যাঁ, ওঁর শরীরটা ভালো নেই আজ।

—তা হ'লে—

—হ্যাঁ, উঠি তাহ'লে। এসো লটি। ও, লটি, দেখতো গাড়ি এসেচে কিনা—টুটু মহিলাচক্র ত্যাগ করে এগিয়ে এসে বললে, ও আর দেখে কি হবে। চলুন আমিই পৌঁচে দিয়ে আসি।

লটি আপত্তি করে বললে, না, না, তাতে কাজ নেই। কি হবে খামখা। আর এত রাতে, কষ্ট করে—

—Pleasure, কষ্ট নয়, চলুন।

মিসেস দাস পুলকিতভাবে বললেন, অনেক ধন্যবাদ, টুটু so kind of you, আচ্ছা, গুডবাই,—বাই—

সম্মিলিত হাতনাড়া ও অভিবাদনের কোলাহল ত্যাগ করে তিনজনে বেরিয়ে এলেন। দু'সেকেণ্ড পর মল্লিক জুনিয়রের লম্বা নিচু স্পোর্টিং সানবীম নিঃশব্দে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ড্রইংরুমে বসে সানবীমে টুটু মল্লিকের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে সরকার সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

মাস তিনেক পরের এক রবিবার।

দুপুরের খাবার পর লটি তার শোবার ঘরে বইয়ের শেল্‌ফের কাছে বছর খানেকের জমানো ন্যাশ ও স্ট্রাণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করছিলো। পরনে লালপেড়ে গরদ, গায়ে ওই কাপড়েরই একটা

ঢিলে আস্তিন জামা। ভিজে চুলের বোঝা ডগায় গেরো দিয়ে পিঠের ওপর ছাড়া।

জানলা দিয়ে একরাশ হেমন্তের মিঠে রোদ তার গায়ে পিঠে এসে পড়েছে।

সে গুনগুন করে রেণু চৌধুরীর কাছে সম্প্রতি শেখা একটা বাঙলা গানের এক চরণ ভাঁজছিলো, আর তারই ফাঁকে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলো।

—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে—গুনগুনিয়ে! বারে গ্ল্যাক্সো বেবি! দেখলেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়!···ঘরেতে······

দরজার কাছে শব্দ শুনে সেদিকে না তাকিয়েই সে বললে, কোন হ্যায়—

পর্দার ফাঁকে শ্বেত শ্মশ্রু 'বয়ে'র পাগড়ি দেখা গেল।

—ক্যেয়া হ্যায়, বয়? সাব্ বোলা রাহা? বহুৎ খু'—বোলো ম্যয় আরহি—আভী হি—

উঠে টয়লেট-র‍্যাকের ওপর থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ হাত পা ভালো করে মুছে, কপালের ওপর ব্রাশটা দু' একবার বুলিয়ে সে নিচে চললো।

বসবার কামরায় ঢুকতে গিয়েই লটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। দাস সায়েবের পাশে সেরিডানের ওপর একজন যুবক বসেছিল। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, ঈষৎ তামাটে, চওড়া কপাল ও প্রকাণ্ড নাক—গ্রীক ভাস্করের খোদিত মূর্তির মতো। পোশাক পরিচ্ছদ সায়েবী ও আড়ম্বরহীন। একগোছা চুল বাঁ কপালের ওপর এসে পড়েছে। বোতাম-খোলা কোটের তলায় মস্ত বড় বুকটার ওপর 'টাই' অবিন্যস্তভাবে হাওয়ায় উড়ছে। ওপরকার ঠোঁটের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

একটু ইতস্তত করে লটি বললে, Sorry Dad, জানতুম না আর কেউ আছেন।

—আর কেউ মানে দিস জেণ্টলম্যান, অর্থাৎ ডাকু তো ? তোমার ঘাবড়াতে হবে না লটি, ওর সামনে তুমি at home feel করতে পারো। She is Lottie ডাকু, সেই নোয়াখালির ছোট্ট ফ্রকপরা লটি। একে তোমার মনে নেই লটি, সেই ডাকুদা—নোয়াখালির মিঃ রায় ছিলেন ডেপুটি, তাঁর ছেলে। তোমার তো ভালো নাম আছে ডাকু—হ্যাঁ হ্যাঁ শঙ্কর,—শঙ্কর রায়।

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, লটি হাত বাড়ালো দেখে করকম্পন করে বললে, নোয়াখালির পরেও দেখেচি আপনাকে দার্জিলিং-এ দুয়েকবার। সানি ব্যাঙ্কে—

—আপনি যেতেন চৌধুরীদের বাড়িতে ? দেখিনি তো।

—দুর্ভাগ্য ! অথচ শেষবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম। নোয়াখালির কথা তো আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়, তখন আপনি বেজায় ছোট।

—হ্যাঁ, তবে আপনিও সে সময় বিশেষ বড়ো ছিলেন না মনে হয়।

হেসে শঙ্কর বললে, না। এই ধরুন বারো-তেরো।

—তাই বলুন ! আপনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় মাত্র।

—দাস সায়েব বললেন, আচ্ছা লটি, তোমার মাকে যে ডেকে পাঠালুম, এলেন না তো,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস দাস ঘরে ঢুকলেন। জামা কাপড়, চুল, জুতো—ফিটফাট, মুঠোর রুমালটা একবার নাকে ঘসে তিনি বসলেন।

—লীলা, চিনলে একে ? দাস সায়েব জিগ্যেস করলেন।

—অস্ফুট স্বরে মিসেস বললেন, কই—

—ভালো রে ভালো ! সুরেন রায়ের ছেলে, ডাকু। সেই নোয়াখালিতে—ওঃ তুমি বেশি দেখনি ওদের বটে।

মিসেস দাস হাত বার করে বললেন, Good day, Mr. Roy—well, how do you do—

হাত কাঁপানো সমাধা করে, ভালো করে বসে শঙ্কর বললে, আমি বেশ আছি। আপনি ভালো তো ?

মিসেসের দু'চোখ লাল হয়ে উঠলো। মিঃ দাস ও লটি হোহো করে হেসে উঠলেন।

দাস সায়েব বললেন, লীলা, তুমি মিঃ রয়, মিঃ রয় করচো কাকে? ও ডাকু, নামেও কাজেও—ব্যস্ সেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নামেও, কাজেও। কি বলো হে ?

লটির সাগ্রহ হাসি-রঙিন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ডাকু বললে, কিন্তু সমাজে বাস করে নামের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন যাপন করলে কি আর চলবে—

—আরে বাদ দাও তোমার সমাজ! সেই ছেলেবেলার মতো ডানপিটেই রয়েচ নাকি এখনো ? মারামারি করে হেস্টিংস হাউস ছাড়লে সে আমি এখনো ভুলিনি।

—তাইতেই তো সায়েব হওয়াটা পুরো হয়ে উঠল না। আর দু'দিন থাকলেই খাস বিলেতিদের সাথে টেক্কা দিতে পারতুম। বলে ডাকু হাসলো, তারপর বললে, সে শুধু প্যাপীর জন্যে। খেলাধুলায় ওরকম বরাবর হয়, বিশেষ হকিতে। তাই বলে মাস্টাররা মোড়লী করতে আসে না। হাতে ছিল ডাণ্ডা, মাথায়ও বোধকরি খুন চেপেছিল! কষ্ট হয় টুটু মল্লিকের জন্যে। অবশ্য তার ছোটমানষেমির যোগ্য শাস্তি হয়েছিল। তবে মারটা একটু বেশিই খেয়েছিল, দিন দশেক ছিলো হাসপাতালে।

—কোন টুটু ? মল্লিক সায়েবের ছেলে ?

—হ্যাঁ, তারপরই ওর বাবা ওকে বিলেত পাঠিয়ে দেন। শুনলুম ফিরেচে নাকি বছরখানেক হ'লো।

—হ্যাঁ, বারে জয়েন করেচে। লীলা, তুমি ওর কীর্তিকলাপ শুনে ভাবচ, বুঝি ও একটি আস্ত গুণ্ডা। He is a self-made man. নিজের জোরে রেলে বড় কাজ পেয়েচে। জামালপুরে।

—যাক এখন নয়, কোথায় উঠেচ এসে কোলকাতায় ? হোটেলে ? সে কি ? সুরেনের ছেলে আমি থাকতে এসে হোটেলে উঠবে—না, না, absurd ! আজই সন্ধ্যার ভেতর চলে এসো, ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ। No arguments ! তোমার একজন দাদা জুটলো লটি, বহুৎ বদমাশ,—ডাকু দাদা।

বলে দাস সায়েব সস্নেহে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

মিসেস দাস গম্ভীর মুখে ঘাড় কাৎ করে পরম মনোযোগের সাথে কাঁধের ব্রোচটার শিল্প সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন, এইবার গম্ভীরতর ভাবে দাস সায়েবের দিকে তাকালেন।

লটি ভাবলে, ওয়েল—বেশতো ! ডাকু—ডাক্‌কুদা !

তারপর ডাকুর দিকে তাকিয়ে বললে, কখন আসছেন তা হলে ? সত্যি, না এলে ভারি দুঃখিত হবো আমরা, হবো না মাম্‌ ?

দীর্ঘ দেহ টান করে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, এলে আমি বেঁচে যাই সত্যি, তবে আপনাদের ভুগতে হবে।

দাস সায়েব বললেন, আচ্ছা, আদবকেতা তোমায় মানায় না। We shall expect you before tea, বুঝলে ? লীলা, তোমার কোন engagement নেইতো বিকেলে ?

—আছে বৈ কি। I am going to Mullick's for tea—

—বেশ লটি থাকবে।

—সেকি ? ওকে তো যেতেই হবে, তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন।

মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যেন লটিকে কায়দায় আনতে পারলে না। সে বাধা দিয়ে বললে, না, আমি যাবো না। Not feeling up to it—

দাস সায়েব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে তুমি বেরোবে না। ডাকু, তুমি ঠিক এসো তাহলে।

—আসবো। চললুম খুড়িমা। চলি মিস দাস।

ডাকু যাবার পর খানিক চুপ করে থেকে মিসেস বললেন, আমি আমি নেভিতে যাচ্চি, যাবে তুমি ?

লটির যেন আজ কি হয়েছিলো। সে বললে, বাব্বা এই দুপুরে ! আমি তার চেয়ে একটু ঘুমুবো।

—কি আলসেই হচ্চো দিন দিন।

ঈষৎ হেসে, লটি বললে, আলসে নয়, তবে দিনরাত ওই পোশাক পরিচ্ছদ ঘাঁটতে ভালো লাগে না আর। আমার এখন একটু পড়তে ইচ্ছে করচে।

বিস্মিতভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ উঠে গেলেন। লটি সশব্দে চটিতে পা গুঁজে গুন্‌গুন্ করতে করতে ঘরে চললো।

ঘরে গিয়ে লটি দেখলে, বিছানার ওপর তার জাপানী স্পানিয়েলটা দিব্যি গুড়িসুড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্চে। অন্যদিন সে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়তো, কিন্তু আজ তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললে, জানিস রুবি, মেরে দাদা মিলা একঠো,—ডাক্‌কু, ডাক্‌স্, ডিক—তবে রে পাজি কুকুর, আচ্ছা নাক চেটে দিলি কি বলে, বল তো !

কোল থেকে রুবিকে নামিয়ে দিয়ে, লটি মুখে চোখে জল দিয়ে এল। তারপর একখানা বই হাতে করে শুয়ে, বইখানা খোলবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো।

দিন দশেক পর কলকাতা ছাড়বার দিন, দুপুরে খাবার পর লটির ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকু ডাকলে, লটি শুনছো ?

—কি ?

—শোনো।

লটি এসে বেতের চেয়ারটার ওপর বসলো। পাঁচিলে হেলান দিয়ে ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, বললে, আজ আমি যাচ্চি, জানো।

—হ্যাঁ।

—ছাখো, ভালো করে গুছিয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলি, দোষ নিও না।

—আচ্ছা, বলে লটি একটু অবাক হয়ে তাকালে। তারপর বললে, কিন্তু কথাটা কি তা না বলে শুধু বাজে বোকচ।

—তাহলে বলে ফেলি। ওয়ান—টু—থ্রী, তুমি আমায় বে' করবে?

লটি অবাক। হবারই কথা, কারণ ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বিয়ের নানারকম প্রস্তাবের বিবরণ সে পড়েচে। কিন্তু এ রকমটা তার ধারণার বাইরে। তার হাসা উচিত, না চটা উচিত কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকাতে লাগলো।

ডাকু হোহো করে হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি আশ্চর্য হবে জানি, কিন্তু আমি সঠিক জবাব চাই। 'না' বললে আমি খুশিই হবো, যদি তাই তোমার মনের কথা হয়।

ডাকুর কণ্ঠস্বরে একাগ্রতা প্রকাশ পেতেই লটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

ডাকু বললে, তুমি ভেবে সন্ধ্যার আগে আমায় বলো। হ্যাঁ, একটা কথা বলে ফেললাম। নোয়াখালিতে, তখন অবশ্য খুবই ছোট—কিন্তু ছেলেবেলার সে আকর্ষণের পরিণতির পরিচয় পাই দার্জিলিং-এ। যাক, তোমার জীবন কি পথে চলেছে, জানিনে, হয়তো আমার ভবঘুরের জীবনযাত্রার সাথে তার আগাগোড়াই গরমিল। যদি অপ্রীতির কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা করো, তবে খুলে বলো, আমি জানতে চাই। না জেনে ঢের দিন গেচে, আর সংশয় সইতে পারিনে।

ডাকু উঠতেই লটি মৃদুকণ্ঠে ডাকল, ডাকুদা—

—ডাকচ?

—হ্যাঁ।

—কি, বলবে?

লটি চুপ করে থাকলো। তারপরে মুখ তুলে বললে, যদি আমি সন্ধ্যার আগে কিছু ভেবে ঠিক না করে উঠতে পারি ?

ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, এইবার চেয়ারের হাতলে ওপর বসলো। বললে, বেশ অপেক্ষা করবো।

—আজই যাবে ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—আবার আসবে কবে ?

—শিগগির নয়। ছুটি পাওয়া বড় শক্ত। তুমি লিখো।

—লিখবো।

—বেশ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও ? কোন কথা—

—দরকার নেই।

—তা'হলে চলি এখন নিচে ?

—আচ্ছা।

সন্ধ্যের ডাকগাড়িতে লটির জবাব না নিয়েই ডাকুকে কলকাতা ছাড়তে হলো। গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্তে লটি বললে, আমি লিখবো।

ডাকু যাবার পর এক সপ্তাহ না যেতেই একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল। লটি বাড়ি ছিলো না। সায়েব জানতেন ব্যানার্জি পরিবারের সাথে সে এম্পায়ারে গেছে। কথাটা আংশিক সত্য, সে ছবি দেখতে গেছে সত্য, কিন্তু গেছে বিজুতে, এবং টুটুর সাথে। এটুকু মেমসায়েবের কারসাজি।

দাস বলছিলেন, ডাকু পৌঁছে চিঠি লিখেচে। একটা অদ্ভুত খবর আছে। সে লটিকে বিয়ে করতে চায়।

—Heavens! ওই ভূতটার সাথে লটির বিয়ে! কি স্পর্ধা! Unmannerly half-civilised boor—

—তার মানে? সোসাইটির সঙগুলোর মতো ইংরেজী বুকনি কাটে না, কথায় কথায় দিব্যি গালে না, বেপরোয়া মদ্যপান করে না, এই তো। আমার ডাকুকে ভালো লাগে।

—তা লাগুক। বিলেত যায়নি, একটা আস্ত জানোয়ারই তো রয়ে গেচে এখনো। সমাজেও ওর কোন স্থান নেই।

—একবার বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেতো? আমাকেও তা'হলে জানোয়ারের দলে ফেলচো তো?

মেমসায়েব কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিলেন। বললেন, তা নয়, তা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারচি না, অর্থাৎ, set-এর বাইরে একজন অজানা অচেনা—

দাস সায়েব বাধা দিয়ে বললেন, একটু সমঝে। তুমি যে ডেপুটির স্ত্রী, একথা তুমি ভুললেও, বাঁড়ুজ্যে মল্লিক পরিবারের কেউই এক লহমার তরে ভুলবে না জেনো। শঙ্কর রায়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে তোমার অমর্যাদা হবার ভয় নই। সোসাইটির গিন্নীদের জিগ্যেস করে দেখো, যে ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁদের অনেকেই বর্তে যাবেন। ও যে কাজ করে, সে কাজ পাবার জন্যে বহু বিলেত-ফেরত মল্লিক-বাঁড়ুজ্যের ছেলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললে। কাদের নিয়ে তোমার set লীলা? নিজের দেশে পরদেশী, অ্যাকটিং এবং কৃত্রিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনকয়েক তাসের সায়েব-বিবি। রাস্তার ভিখিরীর যা কালচার, যা tradition, তাদেরও তাই,— তফাত শুধু সিল্ক স্যুট ও ছেঁড়া-কাঁথার। সে অত্যন্ত স্থূল তফাত। যাক। তর্ক বৃথা। আমি নিজে মনে করি তোমার টুটু মল্লিকের চেয়ে ডাকু অনেক উঁচু দরের ছেলে।

—টুটুর নাম করচো কেন? সে কী করলে তোমার?

—করেনি কিছু, কিন্তু ওই একটি লোক আছে, যাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

—গা তোমার জ্বলে যেতে পারে, কিন্তু এই তোমায় বলে

রাখচি আমি, তার চাকর থাকবার যোগ্যতাও নেই তোমার ডাকুর।

টুটুর প্রতি দাস সায়েবের মনোভাবের আঁচ মিসেস পেয়েছিলেন; তাই লটির সাথে তার মেলামেশাটাকে যতদূর সম্ভব আড়াল করে রাখতেন। শুধু আড়াল নয়, মেলামেশার সুযোগ ঘটাতেও মেয়ের প্রতি তাঁর হিপ্নোটিজম বিদ্যার প্রয়োগ করতে হোত প্রায়ই।

তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছে টুটুর সাথে সম্পর্কটা পাকা করে ফেলেন। তা'হলে সিভিলিয়ান বৈবাহিক সুবাদে ডেপুটিজায়াত্বের হীনতাটুকু একেবারে শেষ হয়ে যায়। টুটুর সম্বন্ধে যে সব কথা কানে আসে, সোসাইটিতে সে সব তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ও বয়েসে ও-রকম একটু আধটু সব ছেলেরই হয়।

কিন্তু স্বামীর বর্তমান মনোভাবে এ অভিলাষ প্রকাশে অনেক বিপদ। তাই সর্বাগ্রে তিনি মেয়েকে পোষ মানাবার ফিকিরে ছিলেন।

দাস সায়েব একখানা বইয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, তাইতো রাত হয়ে চললো যে! Time they were back!

মিসেস বললেন, কটা বেজেচে?

—ন'টা।

—ভারি রাত হয়েচে। দশটার আগে তো ছবিই শেষ হবে না। দাস সায়েব কথা কইলেন না। বই হাতে আপিস কামরার দিকে উঠে গেলেন। মেমসায়েব লাইব্রেরিতে চিঠি লেখা নিয়ে বসলেন।

লটির মনের গভীরতা ছিলো না বললে ভুল হবে; কিন্তু সে গভীরতার ওপরের জলরাশি ছিলো ঘোলাটে। তাই তরঙ্গ উঠলে আলোড়ন তলস্পর্শ করতো না। কিন্তু ইদানীং যেন সে নিয়মের ব্যাতিক্রম হতে শুরু হয়েছিলো।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের কৃত্রিমতার চাপ তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হ'তো, সমাজটা যেন একটা দানব, যেন কি এক উগ্র নেশায় মত্ত হয়ে চালকহীন রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ভীমবেগে চোখ লাল করে ছুটে চলেচে—কোনো রকমে পায়ের তলায় লাইন দু'টো বেঁকে বসলেই ধ্বংস অনিবার্য। কোন আশা, কোন মঙ্গলের সম্ভাবনাও নেই—ঝোড়ো হাওয়ায় যেন তীব্র হিংস্র বিদ্রূপ, টিটকারি দিয়ে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে তার অন্তর আর্ত হয়ে উঠতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মাঝে মাঝে সে ভাবতে বসতো। পড়বার বাতিক তার চিরদিনই ছিলো, কিন্তু পড়ে সে সম্বন্ধে ভাববার অভ্যেস ছিলো না। এইবারে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতে গিয়ে এই কথাটাই তার বারে বারে মনে হত যে, সুন্দরের অভাবের অবস্থাটা হয়তো তবু সওয়া যায়, কিন্তু অসুন্দরের উপস্থিতি অসহ্য।

তার এ ক্ষণিক উন্মেষের আয়ু দীর্ঘ হ'তো না, ভগ্নস্তূপের ক্ষণদ্যুতি স্ফুলিঙ্গের মতো চরম পরিণতির দিকে ঢলে পড়তো।

আজ টুটু মল্লিকের সাথে বেরোতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিলো, কারণ অনেক। কিন্তু একটিও বলা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মা-কে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

একটি জিনিস সে বুঝেছিলো, মল্লিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা মা-র কাম্য। কিন্তু যা বোঝা তার সর্বাগ্রে উচিত ছিলো, অর্থাৎ এ আত্মীয়তার ওপর নিজের মন বিরূপ, সেইটেই সে পরিষ্কার বোঝেনি।

ছবি সাড়ে আটটায় ভাঙলে, বেরিয়ে লটি বললে, আমি বাড়ি যাবো, আমার মাথা ঘুরচে।

টুটু বললো, I say, what—মাথা ঘুরচে, এতো ভালো কথা নয়! Let us have some food first—খাবার সময়ও হয়ে গেচে।

—খাবার জন্যে নয়। তুমি যে কোল্ড-ড্রিঙ্ক দিলে এনে, সেইগুলো খাবার পর থেকে। বিচ্ছিরি ঝাঁঝ লাগলো।

টুটুর ঠোঁটের ধার দিয়ে পাতলা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল। বায়স্কোপে প্রারম্ভিক হু'পেগে তার পানতৃষ্ণা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছিলো। তাই সে অধিক বাক্যব্যয় না করে বললে, still, খেতে তো হবে। চলো ফার্পোতে।

হোটেলে ঢুকে লটি বললে, তুমি কিছুতেই drink করতে পাবে না। মাতালের সাথে ঘুরতে ভয় করে।

টুটু বললে, মাতাল ? কি যা-তা বোলচো ? হুইস্কি অবশ্যই আমি খাই, কিন্তু তা ব'লে—যাক। I say, তোমার মাথা ঘুরচে বলছিলে না, দাঁড়াও let me get soothing something for you—

—আমি কিছু খাবো না।

—এখানে scene ক'রো না। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে-টড়ে যাবে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে।

জিন মেশানো জিঞ্জারের প্রভাবে লটির মাথা তখন বেশ ঝিমঝিম করছিলো। সে আর কথা বললে না।

ডিনার যখন শেষ হলো, তখন রাত সাড়ে দশটা। ততক্ষণে টুটুর ছ'পেগ হুইস্কি ও হু'টো কক্‌টেল এবং লটির চারটে 'soothing something' শেষ হয়ে গেচে !

নিচে গাড়িতে এসে টুটু বললে, what about a long drive ? বাড়ি যাবার আগে বুঝেচ তো—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা—

লটির কিছু বলবার মত অবস্থা ছিলো না। সে জড়িত স্বরে কি বলবার চেষ্টা করে টুটুর কাঁধে মাথা রাখলে।

শিস্ দিয়ে টুটু অ্যাকসেলারেটারে পা দাবালে। কলকাতার রাস্তা পার হয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বেগে ছুটলো।

রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে, মিসেসের সুবন্দোবস্তে লটির নিজের ঘরে পৌঁছোতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখে মিসেসের মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠলো। অনবরত দাঁত দিয়ে

ঠোঁট চেপে থাকতে থাকতে লাল ঠোঁটে গভীরতর লাল দাগ কেটে দাঁত বসে গেছে। চোখ দু'টোর রঙ হয়েছে অস্তসূর্যের আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মতো। চুল অবিন্যস্ত, উড়ছে।

সারাদিন বিনিদ্ররাত লটি মুদিত চোখের ওপর বায়স্কোপের ফিতের মতো অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের ছায়া ঘুরতে লাগলো। পাশবালিশের সুখকর উত্তপ্ত আলিঙ্গনের সাথে সাথে মত্ত টুটু মল্লিকের প্রসারিত বাহুর বিভীষিকা ফুটে উঠতে লাগলো।

নারীজীবনের প্রথম জৈবযজ্ঞে নিহত, নিশ্চেতন মানসকে আবরণ করে, তার সর্বাঙ্গ অসহায় ভীতিতে থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগলো।

দিন যায়, ডাকুকে আর লেখা হয়ে ওঠে না। লেখবার মতো গুছিয়ে কথাও যোগায় না, লিখব বলে তোড়জোড় করে বসতে আলসেমি লাগে। লটি যেন দিন দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।

সে হঠাৎ অসামান্যা রূপসী হয়ে উঠেছে। দেহ-তটে যৌবনের বান ডেকেছে। পাড় উপচে পড়ো পড়ো। কিন্তু চোখের কোণে চিন্তার কালিমা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

মিসেসের মন খুব ভালো। লটি কোনদিনই তার অবাধ্য ছিলো না। এখন যেন আরো বাধ্য হয়েছে। টুটুর সাথে বেরোতে তার আপত্তি নেই, আর্মি নেভি-র সেলেও দিনে দুপুরে, যখন তখন, সে মায়ের সাথে বিনা ওজরে বেরিয়ে পড়ে। মিসেস এমনও আশা করেন যে, টুটুর সাথে আর একটু ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়লেই, তিনি সম্বন্ধের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলবেন। তাঁর মনে ডাকু-ঘটিত একটা আশঙ্কার কারণ সর্বদাই জাগরূক ছিলো, বিশেষ করে দাস সায়েবের মনোভাবের পরিচয় পাবার পর থেকে। Absurd, তাহলে সমাজে বাস ওঠাতে হবে। মল্লিক বাড়িতে তিনি আর যাবেন কোন মুখে।

সেদিন মল্লিকের বাড়িতে ডিনার ছিলো, ডিনারের পর সবাই বসবার কামরায় সমবেত হ'লে, ভায়োলেট মিত্তির লটিকে একলা বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, চলো একটু বেড়াই।

—চলো।

কিছুক্ষণ ফুলের বেডের ধার দিয়ে ঘোরবার পর হঠাৎ ভায়োলেট বললে, I say Lottie what has Tutu done to you—I mean—

লটির মুখ সহসা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। সে অস্ফুটস্বরে বললে, কিছু না।

ভায়োলেট ঐকান্তিক সৌহার্দ্যের সুরে বললে, সে বুঝলাম। কিন্তু তুমি তো বেবি নও লটি, আত্মরক্ষার এডুকেশনও কি তোমার হয়নি ? —Or are you thinking of getting stuck to that worm ? আমি অনেক আগেই এঁচেছিলুম কিন্তু—, তারপর ক্ষুণ্ণভাবে বললে, আমার উচিত ছিলো তোমায় সাবধান করে দেওয়া। তোমার মা জানেন ?

লটি মৃদুস্বরে বললে, আমি বলিনি।

—বলে ফেলো, আর দেরি করো না। এমনিই বোধ হয় দেরি হয়ে গেচে।

অজ্ঞাত বিভীষিকায় লটির সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার আচ্ছন্ন মননে যে সব কথা রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে পারেনি, ভায়োলেটের খোলাখুলি কথাবার্তার পর সে সব জোয়ারের জলের মত তার চিন্তাকে প্লাবিত করতে লাগলো—

রাতে বাড়ি ফিরে সে ডাকুকে চিঠি লিখতে বসলো। একান্ত নির্ভরের স্বপ্নে তার চোখের সামনে চওড়া একখানা বুকের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। চিঠি লিখে, সীল করে, সে যখন উঠলো, তখন রাত আড়াইটে।

মায়ের কথাতেই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত, অথচ জ্ঞান হবার পর যেচে

তাঁকে কিছু বলতে যাওয়ার স্মৃতি মনে আসে না। আজ এই অসম্ভব সময়ে পা টিপে টিপে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, মা—

সে রাত মায়ের ঘরে, মায়ের পাশে শুয়ে কাটলো।

ডাকুর চিঠির জবাব আসে না। লটির দিন কাটে না। একা ঘরে থাকা আর ওষুধ খাওয়া—এই কাজ। তার অসুখ।

তার অসুখ, সেই দুশ্চিন্তায় দাস সায়েবের মাথার সব কটা চুল সাদা হয়ে উঠলো। সে শুনেছে, টুটুর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তিকারী টুটু নিজে। কানাঘুষো শোনা যায় সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে; তার বিলিতি স্ত্রী চিঠি দিয়েছে, আসছে।

মিসেস হাল ছাড়েন না। মনে মনে ঠিক করেন, সার এস. এন্-এর ভাইপো অরুণ সিভিলিয়ান হয়ে আসছে, তার সাথে লটির বিয়ে দেবেন। এই আপদটা এখন ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

লটিকে দেখতে যাঁরা আসেন, মিসেস অদম্য উৎসাহে তাঁদের তোয়াজ করে বিদেয় করেন। লটির কাছে ঘেঁষতে দেন না।

তারপর একদিন, এমন করে দিন কাটাবার আর আবশ্যক রইলো না। বাথরুমে গোঙানি শুনে ছুটে গিয়ে সংজ্ঞাহীন লটির ভূপতিত দেহ আবিষ্কার করলেন, যন্ত্রপাতি, ডাক্তার—সব মিথ্যে হ'লো, সে কাহিনীর বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। তারই পরিণতির সূত্রেই এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ডাকু কাজে লাইনে ছিল। ফিরে চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিলো।

এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয়নি।

লুম্-কা

রাঙামাটি থেকে ষোলো ক্রোশ দক্ষিণে চাকমা-বর্মার প্রত্যন্ত সীমায় মিউ-পেং গ্রাম। চাকমা রাজা ভুবনমোহনের অরণ্যরাজ্য ইংরেজ দখল করে নিয়েছিল, নাম দিয়েছিল, হিল-চিটাগং। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী, তথা একমাত্র শহরের নাম রাঙামাটি। নন্ রেগুলেটেড্ জেলা, মানে বিচারের প্রহসন নেই, হাতে মাথাকাটা জোর যার মুলুক তার-এর রাজত্ব। ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার, ইংরেজ পুলিশ সাহেব, ইন্সপেক্টর সাবইন্সপেক্টর পর্যন্ত ফিরিঙ্গি আর ইংরেজ আর নেটিব ক্রিশ্চান। কনস্টেবলগুলোর মধ্যেও ছিটেফোঁটা আধা পর্তুগিজ আধা পাহাড়িয়া প্রাধান্য। একজন মুন্সেফ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিল বাঙালি, তার কাজ ছিল ইংরেজের হয়ে বে-আইনি গ্রাম দখল করে নেওয়া, নির্বিরোধ চাকমাদের ওপর অরণ্য-শুল্ক বসানো, আর এইসব দিনে-ডাকাতিকে আইনসিদ্ধ করা কেতাবী কায়দায়, দুর্বোধ্য কানুনের ততোধিক দুর্বোধ্য ধারা-উপধারা লিপিবদ্ধ করে। চৌহদ্দিতে য়ুনিয়ন জ্যাক পুঁতে সঙ্গিনধারী জনা দুয়েক কারপরদাজ খাড়া করে রেখে এলেই মহামান্য ভারত সম্রাটের সাম্রাজ্যাধীন হয়ে গেল সে এলাকা। আইন আদালত নালিশ ফরেদের বালাই নেই, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের আশঙ্কাও নেই, বুনো জানোয়ারের মত বুনো জাতও লম্বা চোঙা রাইফেলের গুলিকে ডরাতো। ইংরেজ জানতো একটা রাইফেল, একশ' ধনুকতীর কিংবা ছান্-দাওয়ের মহড়া নিতে কিছুতেই পারে না, যদি না আসল হাতিয়ার ভয় সাথে থাকে। সেই ভয় জাগানো আর ছড়ানো, কতো শতো কলাকৌশলে তামিল করে চলেছিল মুষ্টিমেয় কয়টি কটা চামড়ার বিদেশীদের তামাটে ও কালো তাঁবেদারেরা।

ছান্-দাও জিনিসটা কি বলা দরকার। গোলাবারুদ কি চাকমারা জানতো না, তারা চিন্‌ত ও জান্‌ত লোহা, বাঁশ আর বালি।

লোহা দিয়ে হোতো তীর, বাঁশ আর বেত দিয়ে ধনুক দিয়ে হোতো ছান্-দাও, যার হাতল বলে কিছু নেই, আ মুঠো দিয়ে ধরবার জায়গা ছাড়া, যার ফলা আধবিঘৎ থেকে হাতখানেক লম্বা পর্যন্ত হতে পারে, যার পিঠের দিক মোটা আর মুখের দিক ক্ষুরধার, যার ওজন দু আড়াই সেরের নিচে কোনটারই নয়। ছান্-দাও ব্যবহারের বিধিও বড়ো বিচিত্র। পাকড়ে কচুকাটা করার চেয়ে দূর থেকে তাক মাফিক ছুঁড়ে যে কোনো—মাঝারি গাছই হোক, আর জানোয়ার, ইস্তক মানুষের ঘাড়গলাই হোক্—পরিষ্কার দুফাঁক করে দেওয়া। ধারের শান এত পরিপাটি যে দ্বি-খণ্ডিত জীবের ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতই হোত না বহুক্ষণ।

বাঁশ আর বালির মোক্ষম হাতিয়ার ছিল বল্লম। ও তল্লাটে একরকম সরু বাঁশ জন্মায় যার এক গাঁট থেকে আর এক গাঁটে সাত আট ফুট ফারাক। সেই বাঁশের আগার দিক থাগেরে কলমের মতো বেড়ে নিয়ে আট ফুট পাহাড়ে করকচ বালি ভর্তি করা হতো—তখন তার ওজন দাঁড়াত দশ বারো সের কি তারও বেশি। চাক্‌মা মুলুকের আদিবাসীরা বেঁটে, কিন্তু পেশল। ওই ওজনদার বল্লম অবলীলাক্রমে মাথার ওপর তুলে দুপাক ঘুরিয়ে বাঘ কি হরিণ মারা ওদের নিত্যকর্ম ছিল। পাগলা হাতি মারার কায়দা অদ্ভুত। সেক্ষেত্রে বল্লমটার একটা গাঁট ফুঁড়ে বালিভরার জায়গা আট থেকে ষোলো ফুট করা হোত। সেই বিরাটকায় ক্ষেপণাস্ত্রের ওজন তখন কি দাঁড়াতো সহজেই অনুমান করা যায়। সুউচ্চ বিটপীশীর্ষে বালখিল্যদের একজন তর্‌তর্ করে উঠে যেত, সাথে সাথে উঠত সুদীর্ঘ বল্লম। তারপর অপেক্ষা। বেলা গড়িয়ে যেত, রাত ঘোর হয়ে আসত, হরিণেরা বাঘের ভয়ে পালাতো, বাঘেরা অজগরের ভয়ে, আর ক্ষিপ্রগতি ছোটখাটো কতো হিংস্র শ্বাপদ আনাগোনা করত তার লেখাজোখা নেই। চাক্‌মা শিকারি বৃথা অস্ত্রক্ষেপ কখনো করত না ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিঁপড়ে জোঁকের কামড় খেয়ে বসে থাকত।

অবশেষে সাড়া পাওয়া যেত হস্তিযুথের, বুনো হাতি দল বেঁধে চলে। দলপতি, যাকে মত্তমাতঙ্গ বলা যায়, সেই চলে আগে। শিকারির গাছের তলায় এসে পৌঁছোনোর সময়টুকু সঠিক আন্দাজ করে নেয় শিকারী—আর আস্তে আস্তে দীর্ঘ বল্লম ওপরে তুলতে থাকে। বল্লমের ফলা দু'তিন তলা সমান উঁচুতে উঠিয়ে, হিংস্র-শ্বাপদের অভিনিবেশে অপেক্ষা করে।

এসে পড়ে দলপতি পাগলা হাতি গাছের তলায়, যেন এক বিরাটকায় সচল পাহাড়। শুঁড়ের কস্ দিয়ে বিশাল দাঁত বেয়ে লালা ঝরছে, পথের বাধা বিপত্তি সমূলে নির্মূল করতে করতে আসছে সে।

কী মন্ত্রবলে হঠাৎ তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, একপাও আর নড়তে পারে না। পেছনের দলে চাঞ্চল্য জাগে, পশুর সহজাত জ্ঞানে তারা বোঝে যে তাদের দলপতি আর জীবিত নেই। দলপতির উত্তোলিত শুঁড় নামতে নামতে মাটি ছোঁয়, তার মত্ত দেহকম্পন স্থির হয়ে আসতে থাকে। নির্জীব দলপতিকে পেছনে ফেলে অগণিত হাতি ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে, আধঘণ্টার মধ্যে সবাই অন্তর্হিত হয়ে যায় গভীর অরণ্যে।

শুধু দাঁড়িয়ে থাকে হিমালয়ের সুউচ্চ একটি চূড়া—নিবিড়শ্যাম দেহ, দুগ্ধ ধবল দু'টি ঈষৎ বাঁকানো ছ'হাত লম্বা দাঁত, দেহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র চোখ দুটি নিমীলিত।

বল্লম ব্রহ্মতালু ভেদ করে সোজা মাটিতে গেড়ে গেছে—হাতির মাথার ওপর ডগাটুকু জেগে আছে, মৃদু মৃদু কাঁপছে। হাতি নিষ্প্রাণ।

নেমে আসে শিকারী গাছ থেকে, দুর্বোধ্য ভাষায় দিক্ জাগানিয়া জানান দিতে দিতে, পিলপিল করে ছান্-দাও হাতে আরো পাহাড়িয়া চাক্‌মার আবির্ভাব হয়। সরু সরু তীক্ষ্ণধার বাঁশের আগার নল প্রত্যেকের হাতে। শিকারীর হাতেও অমনি একটা নল।

তার পর চলে রুধির পান পর্ব।

হাতির সর্বাঙ্গে নল বিঁধিয়ে রক্ত চুষে চুষে খায় পাহাড়িরা।

পরিতৃপ্ত হবার পর ছান্-দাও দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে হাতির দেহ—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে রাক্ষসেরা যেমন তার সর্বাঙ্গে উঠেছিল, তেমনি করে ল্যাজ বেয়ে, শুঁড় বেয়ে হাতির পিঠে উঠে।

কঙ্কাল, কি দাঁতের ওপর কোনো লোভ নেই পাহাড়িদের—তাদের দামও তারা জানে না। অর্থ মূল্য কি তাই তারা জানে না।

বনবিভাগের ফিরিঙ্গি কর্মচারীরা খোঁজ পেয়ে একদিন এসে সে সব জঞ্জাল সাফ করে, যে জানে সে মহার্ঘ হাতির দাঁত বেচে পয়সা কামায়।

দুই

মিউ-পেং গ্রামের লুম্-কাকে ওরই স্বজাতি বন-বিভাগের চৌকিদার ডাও-কি জেলে পুরেছিল। লুম্-কার অপরাধ, তার ওপর সন্দেহের কারণ ঘটেছিল একটা খুনের ব্যাপারে। রিম্রি লুম্-কার প্রণয়িনী, রিম্রির ওপর কু-দৃষ্টি দিয়েছিল আধা পর্তুগীজ ফরেস্ট রেঞ্জার গোমেস। লুম্-কা ও তল্লাটেই ছিল না যেখানে গোমেস খুন হোলো ছান্-দাওয়ের আঘাতে। গোমেসের মাথাটা নাকি ধড় থেকে কচু-কাটা হয়ে বেরিয়ে বিশ হাত দূরে পড়েছিল। ছান্-দাওয়ের মালিকানা অনুসন্ধান করতে করতে লুম্-কার নাম জড়িয়ে পড়ল। যে কারিগর অমনি এক ডজন দাও বানিয়েছিল, তার একটা নাকি লুম্-কা কিনেছিল একজোড়া বনমোরগ দিয়ে। টাকাকড়ির লেনদেন ওদের মধ্যে তেমন চালু ছিল না, মৌচাক বা জন্তু-জানোয়ার বা পাখ-পাখালি বা ওষধিলতা এইসব ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।

বারোখানা দায়ের একটার মালিক লুম্-কা—ব্যস্, এই প্রমাণেই তার জেল হয়ে গেল দু' বছর, অকাট্য প্রমাণ পেলে ফাঁসিই হোতো—ইংরেজ বিচারকের এইটুকু বিচারবুদ্ধি যে ছিল, সে কথা মানতে হয়।

দু' বছর মেয়াদ শেষে লুম্-কা জেল থেকে বেরিয়ে মিউ-পেং গ্রামের দিকে চলছিল বনপথে পাক্কা ষোল ক্রোশ, কোন্ না একটা রাত ত লাগবেই। চাক্‌মাদের স্বাভাবিক চলন হাঁটা নয়, হাঁটা ও দৌড়ানোর মাঝামাঝি জোরকদম। রণপায়ে ষোলো ক্রোশ যেতে দুঘণ্টাও লাগে না. কিন্তু রাঙামাটির মতো বিদেশ বিভূঁয়ে তল্লাবাঁশের জঙ্গলও হাতের কাছে নেই যে রণ-পা বানাবে একজোড়া, আর সদ্য খালাস জেলকয়েদির খোলামেলা চলাফেরারও উপায় নেই। তার ওপর লুম্-কার মিউ-পেং গাঁয়ে ঢোকা বারণ হয়ে গেছে হাকিমের রায়ে। খালাসের পর তাকে আর কোথাও গিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু রিমরি? তাকে না দেখে ও থাকবে কি করে? আর ডাও-কি? তার মুণ্ডু ফাঁক না করেই বা স্বস্তি কোথায়? মিউ-পেং তাকে যেতেই হবে। কিন্তু নিঃসম্বল নিরস্ত্র লুম্-কা, রাতভোর ওই জঙ্গল পাহাড় অতিক্রম করে চলবে, যদি দেও দানো রুখে ওঠে, করবে কি? জন্তু-জানোয়ার ভয়ের, কিন্তু পাহাড়িরা কেয়ারও করে না যদি হাতে ছান-দাও থাকে। দেও-দানো আরেক কিম্ভুত জীব—অজগর সাপ আসলে, দেখতে অবিকল ঝড়ে পড়া সুসুম গাছের মতো ইয়া লম্বা, ইয়া মোটা—জাত পাহাড়িরাই, গাছে ও সাপে তফাৎ বোঝে না। সেগুলো মুখ হাঁ করে পড়ে থাকে, অন্ধকারে মুখের গর্তে পা পড়লেই হয়ে গেল। কোঁৎ করে গিলে ফেলবে, দাঁত নেই, কাটে না। লড়াই করবার সময়ও দেয় না। রাতনিশুতিতে তার সাথে লড়ে জেতা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। দিনমানে দেখতে পেলে কিছু ভয়েরই নেই—সড়কি, বল্লম, ছান-দাও যা কিছু হাতে থাকলেই হোলো। ওই অজগরকে পাহাড়িরা রাত্তিরে বলে দেও-দানো, দিনের বেলায় বলে মারুষ। মারুষ এক একটা বিশ ত্রিশ হাত লম্বা হয়।

ভাবছিল, আর চলছিল লুম্-কা। শহর শেষ হয়ে মিন্‌টাং-এর ছোট জঙ্গল যেখানে আরম্ভ, সেইখানটায় পাহাড়ি নদীর ধারে ছোট বড় পাহাড় ঘিরে আটদশ ঘর পাহাড়ির বসতি। লুম্-কার মনে

পড়ল, ছান-দাওয়ের ওস্তাদ কারিগর বুড়ো থিবি-লার বাড়ি ওই বস্তিতে। মনে পড়তেই মাথায় একটা মতলব এল।

সাহেব খুন করা চাক্‌মাদের মধ্যে একটা মহৎ কাজ, প্রায় পুণ্য-কর্মের শামিল। ভয়ের বর্ম ভেদ করে দুঃসাহসিকতার ঝিলিক কথনো কথনো তীব্র সূর্যকরের মতো কোনো চাক্‌মার বুকে পৌঁছে গেলে সে এই মহাপুণ্য অনুষ্ঠান করে বসত। ঢাকঢোল বাজিয়ে তারিফ করার সাহস হারিয়েছিল চাক্‌মারা, কিন্তু ঐ চারফুট দুইঞ্চি লম্বা জাতটার সবায়েরি প্রায় সার্বজনীনভাবে এক ফুলে উঠতো নীরব প্রশংসায়। লুম্‌-কা জানতো, গোমেস-খুনের আসামী হয়ে দু বছর ঘানি টানতে গিয়ে সেও একজন কেউকেটা বনে গেছে আদিবাসীদের মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠা কাজে লাগানো যায় কি-না ভাবতে ভাবতে সে থিবি-লার কুঁড়েতে গিয়ে হাজির হোল।

কুঁড়ের সামনে খোলা জায়গায় নেহাইয়ে লোহা ফেলে হাপরের ফুঁয়ে ফুঁয়ে পিটছিল থিবি-লা। আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে হাপরের ফুল্‌কিগুলো সোনার ঝিলিক তুলে জ্বলছিল, নিভছিল।

অশীতিপর বুড়োর হাতের গুলের ওপর কোঁচকানো চামড়া টান টান হয়ে উঠেচে, একটু একটু ঘাম কপালে কণ্ঠায়, আপন মনে কাজ করে চলেছে বুড়ো।

লুম্‌-কা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ দেখল বুড়োর। সদ্যপ্রস্তুত তিন চারটে ছান-দাও পাশে পড়ে আছে। কি তাদের ধার, কি গভীর আশ্বাস তাদের বাঁকানো সৌষ্ঠবে।

থিবি-লা হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

—কে ?

—বাঘ-হাতি-গণ্ডার-দেও-দানো-কটাচামড়ার যম হুজুর, আর আপনার নফর।

হাতের কাজ বন্ধ করে থিবি-লা তাকালো। নিরীক্ষণ করে দেখলে লুম্‌-কা-কে। ইঙ্গিতে বাঁ পাশের হরিণ চামড়ার থলেটা দেখিয়ে দিল।

থলে থেকে ফুস্‌কি নিয়ে আগুন ধরালে লুম্‌-কা। ফুস্‌কি একরকম ঢিলে ঢালা চুরুট—পেল্লায় লম্বা, আর বেজায় কড়া। কসে একটান দিয়ে হাঁ মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়ল লুম্‌-কা, একবারও কাশল না।

থিবি-লা মনেমনে তারিফ করল, মুখে কিছু বলল না। ও চুরুট টেনে যে হজম করতে পারে, কলিজার জোর আছে তার একথা মানতেই হয়। ও অঞ্চলে থিবি-লার তৈরি চুরুটে প্রথম টানের ধমক যে সামলাতে পারে সে যে কেউকেটা ব্যক্তি নয়, সেকথা মনে মনে মানলো বুড়ো।

—হুজুর, আমি আপনার চাকর, ছান-দাওয়ের সাঙাৎ, সাহেব খুনের আসামী লুম্‌-কা, আজ ছাড়া পেয়েছি। আজকে রাতেই মিউ-পেং যাব হুজুর, কিন্তু শয়তানের গোলাম ইংরেজ সরকার আমার সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করেছে। হুজুরকে কিছু ভেট দিয়ে একখানা ছান-দাও চাইব, সে ফুরসৎও আমার নেই। তবে, গাঁ থেকে ফিরে একঝাঁক বাচ্চাফুরৎ হুজুরকে তাগদ বাড়াবার জন্যে খেতে দেব, এটা মরদ কি বাৎ জানবেন।

ইশারায় লুম্‌-কাকে থামতে বলে থিবি-লা। বাচ্চা-ফুরৎএর কথায় খুশি হয়েছে মনে হয়। বাচ্চা-ফুরৎ একরকম ময়ূর হুবহু একরকম দেখতে, কিন্তু সাইজে চড়াই পাখির মত। ওগুলো এসব অঞ্চলের পাখি নয়, কার্তিক মাসে সুসুমগাছের ফল পাকলে খেতে আসে মালয় দেশের কোন্ উপদ্বীপ থেকে, থাকে বড়জোর মাসখানেক, তারপর আবার চলে যায়।

সুসুম গাছের ফলও অতি দুষ্প্রাপ্য—গাছগুলো দু-আড়াই শো হাত উঁচু—আর ফল ফলে একেবারে গাছের চূড়ায়। নিচেও ফলে, কিন্তু ঘনপাতার অন্তরালের ফল বাচ্চা-ফুরৎ খায় না।

থিবি-লা বলে,

—ফুরৎ পাও ত ভালো, এনো। ছান-দাও তোমার যেটা পছন্দ নিয়ে যাও। তুমিই লুম্‌-কা? কত বাহবা দিয়েছি আমরা

তোমার কীর্তিকলাপ শুনে। মিউ-পেং ত অনেক দূর, বর্মা মুলুকের গায়ে। এখন রওনা দিলে রাত্তিরে পৌঁছে যাবে ?

—হুজুরের আশীর্বাদ থাকলে যাব।

—তাহলে আটকাব না। শুঁটকি মোরগমাংস আছে, সাথে নিয়ে যাও। জল ত বেইলাম গাছের ডাল ভাঙলেই পাবে।

বেইলাম একরকম পেঁপে জাতীয় গাছ, ডগা ভাঙলে টুপটুপ করে জল পড়ে, খেলে অল্প নেশা হয়। জঙ্গলে পথে অজস্র গাছ, পাহাড়টা ছাড়ালেই।

সবচেয়ে ভালো ছান-দাওটা নিয়ে, আর একবার থিবি-লা কে নতি জানিয়ে লুম্-কা বিদায় নেয়। শুঁটকি মোরগটা দড়ি দিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে নেয়।

দৈত্যের মত বিকট এঞ্জিন রেলগাড়িকে যেমন সোজা টানা রেলপথে টানতে টানতে ছোট থেকে ছোট্ট হয়ে একেবারে মিলিয়ে যায়, লুম-কা গা ঝাড়া দিয়ে পাহাড় বরাবর হাঁ-করা অরণ্য পথে অদৃশ্য হয়ে যায়, দিগন্ত নয়, অরণ্য তাকে গ্রাস করে।

তিন

মিউ-পেং গ্রামে পৌঁছতে সোন্‌কা নদী পেরোতে হয়। ছোট্ট পাহাড়ে নদী, বারো মাসই জল থাকে, বর্ষায় প্রবল হয়। বর্ষায় পেরোতে হলে গাছ কেটে লতার বাঁধন দিয়ে ভাসানো ভেলার সাঁকো বানাতে হয়, অন্যসময় হেঁটেই পেরোনো চলে। অসম্ভব স্রোত —কিন্তু হাঁটু জল। বেঁটে চাক্‌মারাও অনায়াসে পার হয়ে যায়।

নদীটা ঘন সুসুমবনের হঠাৎ শেষে। এই মনে হয়, এ অরণ্যের আদি নেই, শেষ নেই, হঠাৎ রুপোর পাতের মতো ঝকঝকে সোনকা চোখে পড়ে যায়, পেরোলেই মিউ-পেং গ্রাম। তারপর পাহাড় শুরু, পাহাড় আর ছোট গাছের জঙ্গল, যতদূর চোখ যায়। শোনা যায়, তারই ওপারে মগের মুলুক, চাক্‌মারা ওদিকে যায় না, মগের মুলুক

না কি জাহুর মুলুক, সেখানে পুরুষগুলোকে মেয়েরা ভেড়া বানিয়ে রেখেছে, হাটবাজার কাজকর্ম মেয়েরাই করে, পুরুষগুলো বাহারি লুঙ্গি পরে ঘরে বসে ফুসকি টানে। ফুসকি মেয়েরাও টানে, কিন্তু শহর বাজারে কর্মচঞ্চলতা তাদেরই। পুরুষদের টিকিই নাকি দেখতে পাওয়া যায় না।

আর তাছাড়া, বর্মীরা নাকি কোঠাঘর তুলে তার মধ্যে দেবতাকে কয়েদ করে রেখেছে, সেইখানে ঢুকে পুজো দেয়, আর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই পাপকর্ম করে। ওদের নাকি খারাপ হয়ে থাকবার জন্যে গোটা পৃথিবী আর ছোট একটা বন্ধ ঘরে একটুক্ষণের জন্যে ভালো হওয়া।

চাক্‌মারা তাই ওদের ঘৃণা করে। গোটা পৃথিবীটাই আলো হাওয়া ঝড় বিষ্টি পাহাড় বনসমেত, চাক্‌মাদের সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় মিশে থাকবার জায়গা। ধর্মের কয়েদখানা বানাতে ওদের কেউ শেখায়নি। সূর্য চাঁদ পাহাড় অরণ্য এরাই ওদের দেবতা। এদের কোন কয়েদখানায় বন্দী করবে ওরা ?

সুস্থুম বন শেষে নদী, সেই নদী পেরিয়ে এল লুম্‌-কা, ঢুকল মিউ-পেঙের চৌহদ্দিতে। রাত তখনো শেষ হয় নি, তখনো আলো-আঁধারির আবছা প্রত্যুষ। সূর্য উঠ্‌বে পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে, সে অনেকক্ষণ পরে। দিনের আলোয় তার অনেক আগেই আকাশ ভরে যাবে। গাঁয়ের মাটিতে পা দিল যখন লুম্‌-কা, তখনো সবায়ের ঘুমিয়ে থাকার কথা। কিন্তু লুম্‌-কা আশ্চর্য হয়ে দেখল অনেক লোক জেগেছে, আর জটল্লা করছে পশ্চিমের ছোট জঙ্গলটার ধারে, মাপে ছোট না, ছোট ছোট গাছের জঙ্গল সেটা। আটদশ ক্রোশ টানা সে জঙ্গল, গাছগুলো শেষ পর্যন্ত ছোট হতে হতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছে। ছোটবেলা ঐ সমুদ্রের ধারে অনেকবার গেছে লুম্‌-কা।

জঙ্গলটা ছোট, কিন্তু ওর বদনাম আছে। দেও-দানোরা নাকি

বদহজম হলে সমুদ্রের লোনা জল খেতে ঐ পথে যায়, তাই রাত-বিরেতে ও জঙ্গলে মানুষ ঢুকতে চায় না।

যে লোকগুলো জটল্লা করছে, তারা সবাই হায় হায় করছে মনে হোলো লুম্-কার। কি হয়েছে, দেখতে যাবার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছে ওর মনে, আবার ভয় হচ্ছে, কেউ যদি চিনে ফেলে তবে চৌকিদার পুলিস ধরে নিয়ে আবার তাকে রাঙামাটির জেলখানায় রেখে আসবে। ওর মিউ-পেং-এ পা দেওয়া বারণ করে দিয়েছে ফিরিঙ্গি সরকার। কিন্তু তীব্র কৌতূহলকে ও ঠেকাতে পারছে না। রহস্যটা কি ওকে দেখ্‌তেই হবে।

জটল্লার দিকে না গিয়ে, ও আধ মাইলটাক দূর দিয়ে গিয়ে ছোট জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল। গাছগুলো মাথায় ছোট হলেও বিশ পঁচিশ হাত ত বটেই। আর ভীষণ ঘন। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে জঙ্গল কাটিয়ে লুম্-কা এগোতে লাগল জটল্লার দিকে।

একটু উঁচু মত ঢিবি—টিলা বলে ওরা। তার ওপর দাঁড়াতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে ভয়ে ওর হাত পা কাঠ হয়ে এল।

একট ছোট্ট বছর দুয়েকের ছেলে টলতে টলতে চলছে—ওই খানিকটায় একটু ফাঁকা, রোদ্দুর উঠ্‌লে গাঁয়ের ছেলেরা ওখানে খেলে, তাদের মায়েরাও তাদের ওখানে বেড়াতে নিয়ে আসে।
এ পাশে নদী, জায়গাটাও একটু উঁচু, খুব হাওয়া বাতাস বয়।

একটা অজগর, যাকে ওরা দেও-দানো বলে, বোধ হয় রাত্তিরে কোনদিন সমুদ্রের জল খেতে পশ্চিমে গিয়েছিল, তা না হলে ঐ ছোট গাছের জঙ্গলে দেও-দানোরা বসবাস করে না—আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ছেলেটাকে তাক করে। এত মন্থরগতি যে অভ্যস্ত চোখ ছাড়া ধরতেই পারবে না যে সেটা মাটিতে পড়ে থাকা সুসুম গাছ, না জ্যান্ত কোনো জানোয়ার। ছেলেটা থেকে অজগরের হাঁ-মুখ, মাত্র হাত দশেক দূরে, লুম্-কা জানে ঐ দশ হাত পেরোতেও অজগরটার আধ ঘণ্টা লাগবে।

একটা মেয়ে অনেক দূর থেকে 'বাবারে, মারে, আমার খোকনকে খেয়ে ফেল্লরে' বলে চেঁচাচ্ছে আর চুল ছিঁড়ছে! তার চিল্লাচিল্লিতেই অত ভোরে গাঁয়ের সবাই জেগেছে, আর এসে জুটেছে এক জায়গায়।

লুম্-কার মতো গাঁয়ের আর সবাই যদিও জানে দেও-দানো কত ধীরে এগোয়, তবু কেউ সাহস করে এগিয়ে ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে না. সবায়েরি এক ভয়, সমুদ্রের জল খেয়ে ফিরছে দেও-দানোটা, কি জানি কত তেজ সংগ্রহ করে এনেছে, হঠাৎ যদি তড়বড় করে এগিয়ে এসে গোটা দুতিন মানুষ এক সাথে মুখে পুরে গিলে ফেলে!

এই অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কাই কাউকে এগিয়ে যাবার সাহস জোগাচ্ছে না। ছেলেটার মা. কিংবা ধাই, কিংবা আর কেউ—যেই হোক না কেন, বৃথাই দাপাদাপি করে মরছে।

লুম্-কা দূরত্বটা আন্দাজ করে নিল একবার। তার পরই মনস্থির করে ফেলল। থিবি-লার দেওয়া ছান-দাওটা মেপে দেখল,—তার হাতের মুঠো থেকে গর্দান পর্যন্ত বেশ বড়ো। ওতেই হবে।

তার আফ্‌সোস হতে লাগ্‌ল, শুঁটকি মোরগটা রাত্তিরে খেয়ে ফেলেছে। না হলে, সেইটে ছুঁড়ে দিত দেও-দানোর মুখে, আর অজগরটা যতক্ষণ সেটাকে গিলত, ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে দৌড় লাগাত কসে।

গাঁয়ের লোকগুলো বোকার মতো কেবলি হা-হুতাশ করছে দেখে ওর রাগ হলেও খুব বেশি দোষ দিতে পারল না তাদের। শোনা যায়, দেও-দানোরা শিকার সুমুখে পড়লে অমনি আস্তে আস্তে এগোয়, না হলে এম্‌নিতে ছুটে চলতেও পারে ওরা। যদি শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার রাগে ছুটে গিয়ে পড়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে, দু দশজন মানুষ দ্যাখ্ না দ্যাখ্ লোপাট হয়ে যাবে ওর পেটে! তারপর কয়েক শ' সড়কি বল্লম ছান-দাওয়ের ঘায়ে প্রাণ হারাতে

পারে দেও-দানোটা, কিন্তু অত ভেবে চিন্তে কাজ কি ভিড়ের লোকে করে? একজন যা করছে, সবাই মিলে তাই করতে শুরু করে দেয়, ভাবনা চিন্তার ফুরসৎই পায় না।

হুমড়ি খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল লুম্‌-কা, দেও-দানোটার লেজের দিকে। কিন্তু লেজের কাছে যাওয়া চলবে না জানে সে, ওই লেজের এক এক আছাড়ে ইয়া বড় বড় সুসুম গাছ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। ওকে যেতে হবে হাত দশেকের মধ্যে—পাশ বরাবর। কি করতে হবে এঁচে নিয়েছে মনে মনে—ততক্ষণ যদি ছেলেটা গড়াতে গড়াতে এসে অজগরটার মুখে না ঢুকে যায়।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট।—লুম্‌-কা এইবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ওই ত হাত দশেকের মধ্যেই অজগর—কিন্তু ছেলেটা যে একেবারে মুখের গোড়ায়! হায় হায় শেষরক্ষা হবে ত!

এই সময় আর্তনাদ শোনে লুম্‌-কা।

তোমরা কেউ আমার বাছাকে বাঁচাতে পারলে না—তবে আমিই ছিনিয়ে আনব ওকে রাক্ষসের মুখ থেকে—

তাকিয়ে দেখে,—রিম্‌-রি, তারই রিম্‌-রি, পাগলিনীর মতো ছুটে চলে এসেছে অজগরের মুখে, হাত দিয়ে ধরেছে ছেলেটাকে—সাথে সাথে দেও-দানোটাও বিকট হাঁ করে মুখে পুরতে উদ্যত হয়েছে ওদের। এক লহমার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হাতের ছান-দাও ছুটলো—অজগরের হাঁ মুখের থেকে ঠিক দু-আড়াই হাত নিচে গিয়ে লেগে দুটুকরো করে ফেলল দানোটাকে—হাঁ করা হাঁ আর বোজাবার অবসরই পেল না।

ছান-দাওয়ের ধাক্কায় মাথাটা ছটকে গিয়ে বিশ হাত দূরে পড়ল যেমন দু বছর আগে গোমেস সাহেবের মাথা পড়েছিল। অজগরের মুণ্ডুহীন বিরাট দেহটা কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধড়ফড় করতে লাগল শুধু।

পাহাড়িদের আতঙ্ক হতেও যতক্ষণ, আতঙ্ক কেটে গেলে ফুর্তিতে ফেটে পড়তেও ততক্ষণ। প্রথম বিস্ময়ের ঘা কেটে গেলে সবাই ধেই-ধেই করে নাচতে শুরু করল, আর বিচিত্র ভাষায় সুর করে গান করতে লাগল।

কে যে এই বিপদ থেকে ত্রাণ করল, তার কথা ভিড়ের লোকেরা আদৌ ভাবার বিষয় বলেই মনে করল না, তারা শুধু জানল, বিপদ কেটে গেছে।

কিন্তু রিম্-রি তাকিয়ে দেখল লুম্-কাকে। বলল,

—লুম্-কা—

পেছন থেকে আর একটা গলা, পুরুষ মানুষের, শোনা গেল।

—আমার ছেলে বৌয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি, লুম্-কা ভাই, তুমি এখুনি গাঁ ছেড়ে চলে যাও! আমরা চিরজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব জেনো, যেখানেই থাকো, আমাদের খবর দিও, আমরা যাব। কিন্তু এ গাঁয়ে আর একটুও নয়—যেদিক দিয়ে এসেছিলে সেই দিক দিয়ে চলে যাও। ঐ যে টুনি সেপাইটা আসছে, গোমেসের জায়গায় ঐটেই আছে দু' বছর—যাও, লুম্-কা—ভাই—

লুম্-কা দেখ্‌ল ডাও-কি। চোখের জলে দু গাল ভেসে যাচ্ছে তার।

হুম্‌ড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে জঙ্গলে ঢাকা আঁকা বাঁকা রাস্তায় মিউ-পেং ছেড়ে চলে গেল লুম্-কা।

রাজিন্দর

মকবুল সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে—

এসব কাজে সে আর নেই।

অনেক খুন-খারাবি, রাহাজানি করেছে ও করিয়েছে। শুধু মোটা ইনাম আর লুটের বখরা ছাড়াও দেমাকের ব্যাপার ছিল সে আমলে। এখন অন্য জমানা। টাকার অঙ্ক বেড়েছে, কিন্তু ইজ্জৎ নেই। আজ যে দোস্ত, কাল সে দুশমন।

কাম করানেবালা রহিস আদমিও বিলকুল বেপাত্তা। এখনকার সব শালা বানিয়া। আর বানিয়া তো বাঁদীর বাচ্ছা, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে পেটে মেরে নিজের ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। মকবুলের ইচ্ছে করে ওদেরই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে।

ভাবতে গিয়ে মনে মনে হেসে ফেলে মকবুল। ওই সাতমনি ভুঁড়িগুলো থেকে নাড়িভুঁড়ি না বেরিয়ে কেবল হাজার টাকা লাখ টাকার নোট আর তাল তাল সোনা জহরত যদি বেরিয়ে পড়ে।

রহিস মানে খালি রেস্তদার নয়। দিল্। ইয়া বড়া দিল্ ছিল শাম্সু সাহেবের, ঘড়িওয়ালা বাড়ির সেনবাবুর। কাকে পক্ষীতেও জানত না এসব কে করাচ্ছে। টেগার্ট সাহেব জানত, পূর্ণ লাহিড়ী জানত। ওরা তো পুলিশ। পুলিশ মানেই দলের লোক। কিছু বলত না। ছ'মাসে ন'মাসে জেল খাটবার ভেড়ুয়া জনাকতক হুজুর বরাবর পৌঁছে দিলেই হত। দু-চার মাস জেল খাটত তারা, আর পুলিশ বাহবা পেত। তাদের মাগ-বাচ্চারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত নিজের ডেরায়, নিজের মুলুকে। নিয়মিত মাসোহারা ঢালত শাম্সু সাহেবরা, সেনবাবুরা। পুলিশের সাথে মালিকদের কী ব্যবস্থা ছিল, খোঁজ রাখত না মকবুল। আঁচে বুঝত ব্যাপার একটা আছেই। মোটা দাগের। থাকুক গে।

কাল রাত দুটোয় শালকের রোলিং মিলের মালিকের দালাল

এসে বলে গেছে, দু'শ লোক চাই, আজ বিকেলে কোথায় কি মিটিং আছে ভাঙতে হবে। হামলা করতে হবে। ট্রাম পোড়াতে হবে। স্রেফ শুরু করে দিয়ে কেটে পড়তে হবে। সর্দার দু'শো, আর জনপ্রতি দশ। হুজ্জৎ শুরু হলে আপনা থেকেই চলবে। দোকানপাট লুট হবে, অনেক পকেট মারা যাবে, ঘড়ি আংটি ছিনতাই হবে, দু'দশটা কলিজার ধুকধুকিও বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত। অমন কত হচ্ছে, কে পরোয়া করে।

গিয়া লড়াইয়ে কত লোক মরেছে দেখতে যায় নি মকবুল, কিন্তু লড়াইয়ের সময় খাস কলকাতায় 'ভাত দাও ফ্যান দাও' করে মরেছে বহুৎ লোক। তারপর জনাব সুরাবর্দির লড়কে লেঙ্গের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অমন কত লাখ খুন-খারাবি হয়ে গেল, এখনো হচ্ছে, কে তার হিসেব রাখে। মকবুল নিজেই জানে না কখন তার মন ভিতর ভিতর বিগড়ে গেছে।

সে রাজী হয় নি।

বলেছে এসব কাম ছেড়ে দিয়েছে সে।

কিন্তু আসলে আরও কথা আছে।

ময়দানে জমায়েত হচ্ছে শালকের কারখানার মজুরেরা। হামিদ আর রাজিন্দরের কাছ থেকে খবর পেয়েছে।

হামিদ আর রাজিন্দর মকবুলের জান প্হ্চানের লোক। পাঁচু মামার দোকানের বারান্দায় এক নম্বর পাকা মালের বোতল নিয়ে সন্ধ্যেবেলা বসে ওরা। হামিদ কারখানার আগমিস্তিরি, গন্‌গনে ফার্নিসের মধ্যে বেলচা হাতে দিন কাটায়। রাজিন্দরটা কেরানি।

দুটিতে জবর দোস্তি, যেন এক মায়ের পেটের ভাই। কারখানায় ওরা দেড়শো আন্দাজ লোক খাটে, ভূতের মতো খাটে। মকবুল শুনেছে মুনাফা হয় অঢেল, মালিক নোপচাঁদ মারোয়াড়ি দু'বছরের মধ্যে ভ্যাখ্‌ ভ্যাখ্‌ করতে করতে কলকাতার সাহেব পাড়ায় চার চারখানা নয়া মোকাম তুলে ফেলল।

কিন্তু মজুর কেরানির বেতন বাড়ে না। ভাতা বাড়ে না। এদিকে বাজারে খানাপিনার সব চীজের দাম বাড়ে। ঘরে যাদের বাচ্চা জরু আছে তাদের ডাগদরি হয় না, স্কুলমক্তবের ব্যবস্থা হয় না, ছুটিছাটা নেই, ঘরবাড়ি নেই, বস্তি সম্বল। শুধু আছে কারখানা আর খাটুনি আর মালিকের মোটা মুনাফা।

একদল ছোকরা বাবু ওদের সব বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে যে, চাইতে জানলে আর পারলে সব কিছু পাবে তারা। এই দাবির মিটিং হবে আজ ময়দানে। আরও আশপাশের কয়েকটা কারখানার মজুররাও আসবে। মজুর ছাড়া অন্যেরাও আসবে, যেমন রাজিন্দর। রাজিন্দরটা মজুর নয়, বাবু। কিন্তু ও নিজেকে মজুর বলে। বলে, তপ্ত খোলায় ছোলা কড়াই একসাথে ভাজা হচ্ছি রে শালা, আমরা সবাই মজুর। রাজিন্দরটা মজার মানুষ, মজা করে কথা কয়। আর হোহো করে হাসে।

দালাল বাবু বুঝিয়েছিল যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে পুলিশ কিছু বলবে না। মালিক নাকি নয়া জমানার উজীর ওমরাওদের পেয়ারের লোক। উল্টে মিটিংঅলাদেরই পেটাবে। তাও মকবুল রাজী হয় নি।

কিন্তু একথা মকবুল বেশ জানে যে, সে রাজী না হলেও মিটিং ভাঙবার লোকের অভাব হবে না। আংরেজ যাবার পর বিশ বছরে নাম-না-জানা বহুৎ দল গড়ে উঠছে শহরে। কুর্তা প্যাণ্ট পরা মাওয়ালী ছোকরারা সে দলের পাণ্ডা। এই ছোকরাগুলো কোথেকে গজিয়ে উঠল ঠাহর করে উঠতে পারে না মকবুল। বেশির ভাগই সিটি-দেওয়া সিনেমা-যাওয়া হাফ ভদ্দর গোছের কিন্তু হালচালে হারামির একশেষ। দেখতে পায় ইস্কুল কালিজেও পড়ে কেউ কেউ। আর সবাই কলকাতারও নয়, বাইরে থেকেও আসে অনেকে। মকবুল দেখছে, ওদের বাঁধা কোন দলও নেই, কিন্তু একটা কিছু ঘটলেই দু-পাঁচশো ভোজবাজির মতো হাজির হয়

কোত্থেকে। মিটিং হবে কোন জায়গায় খবরটা দিলেই হল, তারপর লড়ে যাবে ওরা ইচ্ছেমতো দল বেছে। ওদের সাথে ভাড়াটে নয়া গুণ্ডার দলও জুটে যাবে। ওদের সাথে ভাড়াটে নয়া গুণ্ডার দলও জুটে যাবে। ওরা বেশির ভাগই কিন্তু লড়বে মজুরদের হয়ে আর ভাড়াটেরা মালিকদের পক্ষে। এমনিই হামেশা হচ্ছে আজকাল।

মকবুল ভাবে, ইস্কুল কালিজের ছেলেরা তো আগে এত মারপিটে ভিড়ত না। কখনো-সখনো নিজেদের খেলাধুলা নিয়ে ঝগড়া হলে, আর না হয় কোনো বড় লীডরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করলে ছেলেরা খেপত। এখন পান থেকে চুন খসলেই ওরা সব এগিয়ে আসে।

যাক গে। জমানা পাল্টে গেছে। আর কতদিন খোদা রাখবেন এ দুনিয়া, আর কত কি দেখতে পাবে। ষাট ছাড়িয়ে সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মকবুল।

এখন তো সকাল আটটা, আজ আর হামিদ রাজিন্দরের সাথে সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে কিনা কে জানে। বিকেলে তো ওদের মিটিং, কিন্তু হাঙ্গামার খবরটা দেওয়া যায় কী ক'রে।

হামিদ তো থাকে বস্তিতে। তার না আছে জরু, না আছে বালবাচ্চা। রাজিন্দরটা থাকে শালকেতেই, রতনবাবুর গলির এক ভাড়াটে বাড়ির একতলার একখানা ঘরে। ওর বৌ আছে, একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। একদিন পাঁচুমামার দোকানে বে-এক্তার হয়ে যাবার পর পৌঁছে দিয়েছিল, হামিদ পাত্তা বাতলে দিয়েছিল। ভাবল, সেইখানেই খবরটা দেবে।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কী? কারখানা থেকে তো রাতের আগে বাড়ি ফিরবে না রাজিন্দর। খবর দিতে হলে কারখানাতেই যেতে হয়। কারখানারই পথ ধরল সে।

কারখানার ফটকে পাঁচ-সাতটা দরোয়ান বসে গুলতানি করে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বুড়ো রামটহল সিং মকবুলের জানা।

আজ চল্লিশ বছর মঙ্গলা হাটের গুণ্ডা দলের সর্দারি করছে, ওকে চেনে পুরানো লোক সবাই। তাছাড়া চাল বদলায় নি। মকবুল পয়সা বহুৎ কামিয়েছে, উড়িয়েও দিয়েছে। আমীর হয়ে ভাই-বেরাদার থেকে ফারাক হয়ে যায় নি। মঙ্গলবার মঙ্গলবার মস্ত হাট বসে, সেখানকার একদল কুলির সর্দারি করে এখন। প্রায় দু' আড়াইশো লোকের পেমেন্ট হয় ওর হাত দিয়ে, মাস গেলে শ' তিনেক টাকা নিজের থাকে, তাতেই বেশ চলে যায় ওর। বৌ মরেছে তিরিশ সাল আগে, একটা ছেলে ছিল, সেও বছর দশেক আগে মারা গেছে বেমারিতে। ছেলে ওপারে কলকাতার বড়বাজারে চোরাই আপিমের দলে ছিল। এখন নির্ঝঞ্ঝাট মকবুল।

কারখানার ফটকে পৌঁছে রামটহল দারোয়ানের পাশে বেঞ্চের ওপরে বসে পড়ল মকবুল। মেরজাই থেকে একটা বিড়ি বার করে রামটহলকে দিল, একটা নিজে ধরাল।

রামটহল বলল, মর্জি বাতলাও সর্দার। কী মনে করে?

—একবার রাজিন্দরকে ডেকে দিতে পারিস, রামটহল?

—রাজিন্দর?—ও, ফার্নিসের টালিবাবু। তা, কী কাম আছে, মকবুল ভাই?

—বাড়ির খবর।

—ঠার যাও। বলছি রাজিন্দরকে।

খবর পেয়ে রাজিন্দর এল। তাকে নিয়ে একটু দূরে হেঁটে গেল মকবুল। বলল—

—তোদের মিটিং কি আজ হবে?

—হবেই তো। চারটের সময় মার্টিন স্টেশনের ময়দানে।

—সাবধান থাকিস। মিটিং ভাঙবার ধান্দায় দালাল ঘুরছে কাল রাত থেকে। আমি না-কবুল করেছি, কিন্তু লোক পেয়ে যাবে ওরা। ছোরাছুরি খুনখারাবি চলবে।

—বলিস কি মকবুল?

—সাচ্ বাত। বহুৎ কবুল করেছে মালিক।

—মিটিং সেরে আমাকে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বাচ্চা মেয়েটার জ্বর দেখে এসেছি। মামার দোকানে আজ আর যাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু মিটিং-এ—

—না গেলেই ভালো হয় রে, রাজিন্দর। তবে হ্যাঁ, না যাওয়াটাও বেইমানি হয়ে যাবে। যাস, তোরা সবাই যাস। খবরটা সবাইকে দিয়ে দিস। বেইমানি করবি না, দল ভাঙবি না।

—তুই তো আচ্ছা মজার মানুষ রে মকবুল। এই বলছিস না গেলে ভালো হয়, আবার বলছিল না গেলে বেইমানি হবে।

—ভালো করে বুঝে লে, রাজিন্দর। তোরা যা চাচ্ছিস্ সে তো একলা কোন আদ্মির নালিশ না, তোর মতো মেহনতি মান্ষের হাজার জনের দাবি। তোরা তো লুটতরাজ করতে যাচ্ছিস না, সবাই মিলে যা চাস্ জানিয়ে দিবি মালিককে। এতে কসুর কোনখানে? সেরেফ একজন কেটে পড়লেও দাবি কমজোর হয়ে যাবে। তোকে দেখে আর পাঁচজন পিছু হটবে না তুই বলতে পারিস? পারিস না। যদি হটে, তোর বেইমানি করা হবে না? দুনিয়ায় ইমান সব সে ভারী চীজ। ভুলিস না, রাজিন্দর।

—আরে, আমরা তো যাবই। তুইই তো বলতে এসেছিস হাঙ্গামা হবে। আমরা তো আর লাঠি-সড়কি নিয়ে লড়াই করতে যাচ্ছি না, হাঙ্গামা যদি বাধেই, খুন-জখম এক আধটা হওয়া আর আশ্চর্য কী?

—সেইটাই তো মুশকিল কী বাত।

—ধর, যদি আমার কিছু হয়ই, তোরা আছিস্, হামিদ ভাই আছে, আমার পরিবার কিছু ভেসে যাবে না।

—শাবাশ! রাজিন্দর বেটা, শাবাশ। বে-ফিকির চলে যা মিটিং-এ। বালবাচ্চার জন্যে ভাবতে হবে না তোকে।

—তোর ছেলে ইয়াসিন মরে গেছে, তুই আছিস। পটলীর বাপের যদি কিছু হয়ই, তুই থাকবি। কেমন কিনা?

বলে হোহো করে হেসে উঠল রাজিন্দর।

মকবুলের চোখে কী মতলব ঝিলিক দিয়ে গেল ঠাহর করে নি রাজিন্দর। মকবুল বলল,—যা, কারখানায় যা। আমি যাই, অনেক ধান্দা আছে।

রাজিন্দর ফিরে গেল। মকবুল রতনবাবুর গলির পথ ধরল, রাজিন্দরের বাচ্চি পটলীকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে সে। ইয়াসিন—তার জোয়ান ছেলে ইয়াসিনের কথা তুলেছে রাজিন্দর। মকবুলের বুকের মধ্যে কোন্ এক জায়গায় খচখচ করে বেদনা বিঁধছে মনে হল মকবুলের। শাবাশ রাজিন্দর। দল ছাড়বে না বলেছে সে। জান্ গেলেও না।

রাজিন্দরের বাসায় ডাক-হাঁক করে পটলীকে বার করল মকবুল। ন'দশ বছরের রোগা পটকা মেয়েটা, মুখটা খুব মায়ায় ভরা। মকবুল বলল—

—আমি কে জানিস, বিটিয়া?

—না তো।

—তোর বাপের বড়া ভাই আছি আমি।

বাপের হাসির ধাত পেয়ে গেছে মেয়েটা। খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে—

—তাহলে তো তুমি জেঠা।

—হাঁ হাঁ, জেঠা। আমরা বলি চাচা। তুই আমাকে মকবুল চাচা বলবি, বুঝলি। তোর বাপের সাথে আমার দোস্তি বহুৎ দিনের। তোর মাকে ডাকতে হবে না, জানলা থেকে দেখছে টের পেয়েছি আমি। সেলাম বহুজি। তুমিও ভি আমার লেড়কির মতো, বুঝলে?

—বাবা এলে কী বলব, পটলী বলে।

—আরে, তোর বাবার সাথে এখনি কত বাতচিত হল, তবে তো আমি আসছি। তোর বাবার ফিরতে আজ রাত হতে পারে, বলেছে সে।

—তা হোক, রোজই তো রাত নটা হয়।

—আচ্ছা, আমি চলছি তা হলে। আবার দেখা হবে।

বলে মকবুল নিজের ডেরার দিকে ফিরল।

তার এখন অনেক কাজ। তুশো লোক তৈরি রাখতে হবে, দরকার হলে অস্ত্রবিস্তর হাতিয়ার স েত। মালিকরা কী হামলা করবে জানা নেই, তবে পাল্টা হামলার জন্যে ইন্তাজাম যা কিছু, এখনি সেরে ফেলতে হবে। দল তার তৈরিই আছে, নামকরা দল। নামেও অনেক কাটে। পুলিশের সাথেও থোড়াবহুৎ সমঝোতা আছে। তবে দালালটা বলে গেছে যে, মালিক হল উজীরদের লোক। আর পুলিশরা উজীরদের তাঁবেদার। দেখা যাক।

বিকেল চারটেয় মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া আমতা লাইনের স্টেশনের ময়দানের সভা প্রথমদিকে বেশ চলেছিল, দাবিদাওয়া সব পেশ হয়েছিল, কে যেন লিখেও নিচ্ছিল সব। কিন্তু গোলমাল বাধল শেষ দিকটায়। মজুর জমায়েতের ভেতর কে একটা হাত বোমা ফুটিয়ে দিতেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মার-মার কাট-কাট পুলিশ-পুলিশ আওয়াজ উঠল।

মজুরেরা জন কতক ঘায়েল হল, মারও খেল প্রচুর। তার পরেই হামলাকারীরা হঠতে শুরু করল। পুলিশ নয়, আর যেন কারা। রব উঠল, ওরে, মকবুল সর্দারের দল—পালা, পালা।

ধারেকাছে মকবুলকে দেখা গেল না।

কিন্তু কোথা থেকে ভারী গলার হুকুম শোনা গেল—

—ওরে, জানে মারবি না কাউকে। হটিয়ে দে, হটিয়ে দে।

পুলিশ এল অনেক পরে। তখন মজুরদের ওপর যারা হামলা করতে এসেছিল তারা সব ভেগেছে। মজুরদের মধ্যে ঘায়েল হয়ে পড়ে. আছে জনা-চারেক। একটা লোক মিটিং-এর দাবিদাওয়ার কাগজপত্র হাতের মুঠোয় ধরে পড়ে আছে। সে মরে গেছে। সোডার বোতলের ঘায়ে মাথাটা তার তু'-ফাঁক হয়ে গেছে।

মজুরদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য দেখা গেল। যারা পালাচ্ছিল, তারা সব ফিরে এল। কোন শোরগোল চেঁচামেচি নেই, সবাই এসে চুপচাপ জমায়েত হতে লাগল। হাজার মেহনতি মানুষে আবার মাঠ ভরে গেল।

মরা লোকটার ফাটা মাথা কোলে করে বসে দাবির কাগজগুলো জনতাকে দেখিয়ে হামিদ বলল—

—ভাইসব, সব ঠিক আছে। এই আমাদের দাবি। এগুলো না মিটলে কারখানা অচল করে দেব আমরা। এর নকল সব কারখানায় ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে। জান দিয়ে রাজিন্দর আমাদের জান বাঁচানোর রাস্তা করে দিয়ে গেছে। বলো সব, রাজিন্দর ভাই জিন্দাবাদ—

হাজারো লোকের গলায় জয়ধ্বনি উঠল।

অলক্ষিতে বুড়ো মকবুল রতনবাবুর গলির পথ ধরেছে ততক্ষণ। চোখের দু ফোঁটা জল চক্‌চক্ করছে। মনে মনে বলছে, শাবাশ! রাজিন্দর বেটা, শাবাশ!

হরিয়া

রাত দশটায় ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে, হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে গেলেন ধ্যানেশবাবু। ধরা, ধ্যানেশবাবুর চতুর্থ কন্যা, খাবার তদারক করে বাবার। পাশে এসে বসল।

খাওয়া শেষে নিজের ঘরে এলেন। ধরা এ কথা সে কথার পর শুতে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল বাড়ির ছোকরা চাকর হরিয়া খুব মার খেয়েছে ছেলের হাতে। ছেলে কলেজে পড়ে।

—মা'র বারণ সত্বেও লুকিয়ে তিনটের শো'তে সিনেমায় গেছল হরিয়া—'পূজা-কা-ফুল' দেখতে। পাশের বাড়ির গুপে আর দোসাদদের ছেলে পতিতের সাথে। ঝিকে বলে গেছে, ওর সম্পর্কে কে বৌদি আছে তার ছেলে হয়েছে, খবর পেয়ে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু আসল কথা কে যেন ফাঁস করে দিয়েছে, ও-ও অস্বীকার করে নি।

—তা মারধোর করলে কেন? বকে দিলেই হোত।

—বকলে কি আজকাল আর আমলে আনে? দুর্দান্ত বারমুখী মন হয়েছে, এখন খালি সিনেমা মাথায় ঘুরছে। সেদিনও ত জন্মাষ্টমীর রাতে মা পয়সা দিলেন, হোলনাইট ছবি দেখে এল। তাতেও আশা মেটে না ওর।

—আজ পয়সা পেল কোথা?

—শুনলাম গুপে তার মায়ের কাছে দু'টাকা চেয়ে নিয়েছে। তাই দিয়ে গেছে। আর তাছাড়া, খুচরো খাচরা যখন যা পায়, জমায় একটা টিনের কৌটোয়। খরচ করে শুধু সিনেমায়। কি বাতিক যে হয়েছে ছবি দেখার।

ধরা ওপরে চলে গেলে ধ্যানেশবাবু সিগারেট ধরিয়ে একটু লেখাপড়ার কাজে মন দিতে চেষ্টা করলেন। বিলিতী ম্যাগাজিনের ছবি দেখলেন দু'একপাতা, স্ট্যান্‌লি গার্ডনার-এর আধপড়া পাতা-

মোড়া জায়গা খুলে পেরি মেসন'এর কীর্তিকলাপ অনুধাবন করবার চেষ্টা করলেন, মন বসল না। রবিবাবুর পঞ্চভূত খুললেন, কি পড়লেন মনে দাগ কাটল না।

রাত বাড়তে লাগল। শব্দ নেই, তবু যেন গম্ভীর কার গলার আওয়াজ গমগম করতে লাগল কানে। কিছু নেই চোখের সামনে, তবু মনে হল যেন অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার দর্শক তিনি।

বই বন্ধ করে হরিয়ার কথা পূর্বাপর ভাবতে চেষ্টা করলেন ধ্যানেশবাবু।

বছর পাঁচেক আগে হরিয়া এসেছিল তাঁর বাসায়। তখন ভাড়া বাড়ি, বাড়িতে গরুবাছুর ছিল। সংসারের কাজ গিন্নি ঝির সাহায্যেই চালিয়ে নেন, গরুর খবরদারির জন্যে ছোঁড়া গোছের লোক দরকার ছিল।

হরিয়া এক রিক্‌শওয়ালার ছেলে। রিক্‌শওয়ালার বোধ হয় পক্ষান্তর ঘটেছিল, আরো অনেক ছেলেপুলে ছিল তার, যারা কেউ হরিয়ার আপনভাই বোন নয়। হরিয়া তাই প্রায় গলগ্রহই ছিল। পাঁচটাকা মাসবেতন কাজে ঢুকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল তার বাপ।

বারো-তের বছর বয়স তখন হরিয়ার। বয়েস আন্দাজে অসুরের মতো খাটতে পারত। গরুর তদারক ছিল, ভাড়াবাড়িতে টিউবওয়েল ছিল না, ছিল ইঁদারা—দিনে অন্তত দু'শো বালতি জল তুলতে হোত। সব কাজে এগিয়ে আসা ছিল হরিয়ার স্বভাব। পরিশ্রমের কাজ একটা একটা করে সবকটাই এসে পড়তে লাগল তার ঘাড়ে। অম্লান মুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে পারত ছোকরা।

গিন্নির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কর্তা, কি ছেলে যখন বাজারে যেতেন, সমস্ত দিনের অথবা দিনদুয়েকের আবশ্যকীয় মসলাপাত্তি টুকিটাকি একসাথে আনতে দিতে পারতেন না কখনো। ফলে দিন ভোর, 'ওরে জিরে নে আয় এক ছটাক মোড়ের দোকান থেকে'

না হয় 'যা ত চট করে শুক্‌নো লঙ্কা আনত দু আনার' লেগেই থাকত।

শুক্‌নো লঙ্কা যদি বা আনল পনেরো মিনিট পরে, অমনি আবার 'ওই দ্যাখ্, পাঁচফোড়নের কথা ভুলে গেছি। যা ত শিগগির—'

আলস্য ছিল না হরিয়ার ধাতে। চরকির মতো ঘুরত, আবার তার মধ্যে জবার চারা, পুঁয়ের চারা এনে লাগত, পাখির বাচ্চা এনে খাঁচায় পুষত, কঞ্চিতে সুতো পরিয়ে হাতছিপ বানিয়ে পুঁটিমাছ ধরত। গিন্নি মনে মনে খুশি হলেও মুখে প্রকাশ করতেন না, তবে পক্ষপাত জন্মে গিয়েছিল তাঁর হরিয়ার ওপর।

ধ্যানেশবাবুর এত সব নজরে আনার কথা নয়, আনতেনও না। হরিয়া তাঁর লক্ষ্যের মধ্যে এল, যখন থেকে শোবার ঘরে দৈনিক বিছানা তোলার ভার নিল সে।

এ কাজটা উটকো বাইরের লোক করে পছন্দ করতেন না তিনি। ঢিলেঢালা নন তিনি, তবু নিজের ঘরে পয়সাকড়ি কাগজপত্র সব সময় চাবি বন্ধ করে রাখতে পারে না মানুষ। এ পর্যন্ত ঘর মোছবার সময় একবার ঝি ঢুকত ঘরে, আর সব টুকিটাকি কাজ মেয়েরা দেখত।

তাঁর শোবার ঘরে হরিয়ার আক্রমণ ভালো চোখে দেখেন নি তিনি। আর তা ছাড়া, যেটা খুব স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রত্যেক গেরস্তবাড়িতেই হয়—গিন্নির যার ওপর টান, কর্তা তাকে সুনজরে সাধারণত দেখেন না। অপরপক্ষে কর্তার পেয়ারের লোক গিন্নির বিষনজরে পড়বেই।

হরিয়ার ক্ষেত্রে গিন্নির পক্ষপাত তেমন প্রকট না হলেও এঁচে নিতে বেগ পেতে হয়নি। ধ্যানেশবাবু তাই মুখে কিছু না বললেও সদয় ছিলেন না ছোঁড়ার ওপর।

একবার ত জলজ্যান্ত চুরিই ধরে ফেলেছিলেন তিনি। রাত্রে ফিরে শার্টের পকেটে দু'খানা নোট আর রেজকি রেখে শুয়েছিলেন। সকালে মর্নিংওয়াক করে ফিরলেন যখন, বিছানা ওঠানো হয়ে গেছে।

হরিয়াকে গিন্নি ম্যুনিসিপাল স্কুলে প্রাইমারী ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, সে স্কুলে গেছে। যাবার আগে তাঁর ঘরের কাজকর্ম সেরে গেছে।

ড্রয়ার খুলে ছেলেকে বাজারের টাকা বার করে দিয়ে ভাবলেন শার্টের পকেট থেকে রাতের খুচ্‌রো তুলে রাখা যাক। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন একটি টাকা রয়েছে, আর একটি নেই। প্রথমে ভাবলেন কাউকে দিয়েছেন বোধ হয়। মনে পড়ল না। মেয়েরা কাজকর্মে নিতেও পারে। জানলেন নেয়নি।

একটা টাকা কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়, তবে আদৌ কিছু খোওয়া যাওয়াও মেনে নেয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, এর আগে কখনো কিছু যায়নি।

হাজার অভাবে পড়লেও ছেলেমেয়েরা না বলে কিছু নেবে না, জানতেন। গিন্নি ভুলেও এ ঘরে ঢোকেন না। ঝি ঘর মুছে যায় —সে আছেও ঢের দিন। কখনো সন্দেহ করবার মতো কিছু করে নি সে। বাকী থাকে এক হরিয়া। নিঃসন্দেহ এ তার কাজ।

যেমন মনে হওয়া, খুন চেপে গেল তাঁর মাথায়। বয়সও কিছু কম তখন, আর ঠিক সেই সময়টা নানা বিশৃঙ্খলায় মন ছিল অশান্ত। হরিয়া ফিরতেই তাকে নিয়ে পড়লেন, এই মারেন কি সেই মারেন।

সে ত কিছুতেই কবুল করে না। পুলিশের ভয় দেখাতে ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। চোখে জল দেখে স্বভাবতই মেয়েদের টান পড়ে তার সপক্ষে। ফলে বাক্যবাণ সহ্য করতে হয় ধ্যানেশবাবুকেই।

—কোথায় খরচ করে এসেছেন নিজেই, ভুলে গেছেন। দেখলেই হয় হরিয়ার বাক্স-প্যাঁটরা জামা-কাপড়—ও ত স্কুলে গেছিল, লুকিয়ে রাখতে ত পারে নি—ইত্যাদি।

প্রথম উত্তেজনার পর ধ্যানেশবাবুর মনেও খট্‌কা লেগেছিল। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, যে কাউকে ক্লাবে দিয়েছেন, মনে নেই।

কিন্তু না, ঠিক মনে পড়ছে, শার্ট খুলবার সময় বুকপকেট থেকে দুখানা নোটই মাটিতে পড়েছিল, উনি তুলে রেখেছিলেন।

বললেন সে কথাটা। বললেন, যে এই কারণেই তাঁর ঠিক মনে আছে, নোট দু'টোই ছিল, একটা নয়।

হরিয়ার ভয় তখন কেটেছে। তার সমর্থকেরা দলে ভারি, সাহসও ফিরেছে। সে বলল, মাটি থেকে কুড়িয়ে একটা নোট রেখেছে সে বাবুর তোশকের তলায়।

বেরোল সেখান থেকে। জব্দ হয়ে গেলেন ধ্যানেশবাবু বাড়ির লোকের কাছে। কিন্তু তাঁর মনের খট্‌কা ঘুচ্‌লো না। তাঁর মনে হল হরিয়া নিশ্চয় সরিয়েছিল। তোশকের তলায় রাখাও তারি কাজ। যদি তাঁর নজরে না আসতো তবে ঠিক বার করে নিতো তাক বুঝে।

কিন্তু ও নিয়ে আর কিছু বলেন নি তিনি। মনে মনে বিরূপ হয়ে রইলেন হরিয়ার ওপর।

দূরদেশে মেজছেলের অ্যাক্‌সিডেণ্টের খবর এল যেদিন, ধ্যানেশবাবু তখন ডবল প্লুরিসিতে শয্যাশায়ী। আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় গিন্নি রওনা হয়ে গেলেন ছেলের কাছে। বাড়িতে আর সব ছেলেমেয়ে ও হরিয়া রইল। সংসারের ভার, তাঁর পরিচর্যার ভার, সব মূলত এসে পড়ল ধরার উপর।

একসময় দিন দশেকের জন্য এমন অবস্থা হলো যে ধ্যানেশবাবুর মনেও পড়ে না কিভাবে কেটেছে সে কটা দিন। ঠিক অজ্ঞান নয়, অর্ধবিস্মরণের ক'টা দিন।

অস্বস্তির কি অন্ত ছিল? দূরদেশে ছেলে হাসপাতালে, মোটর দুর্ঘটনায় মাথার খুলি ভেঙে গেছে। কৃত্রিম খুলি লাগাতে হবে। প্ল্যাস্টিক সার্জারি চলছে, খবর আসে নিয়মিত, তাতে সান্ত্বনা থাকলেও মন অশান্ত থাকেই।

ধরার য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা। পড়ার ফাঁকে বাপের শুশ্রূষা, ওষুধ খাওয়ানো, এ সব করার পর কতটুকু আর সময় পায়।

রান্নাবান্না কে করে খোঁজ রাখেন না ধ্যানেশবাবু। অন্য ছেলেমেয়ে নিজেদের পড়াশুনার ফাঁকে ঘরের আর বাইরের যাবতীয় কাজ করে যায় বুঝতে পারেন। ছোট মেয়ে এষা ফাঁক পেলেই কাছে এসে বসে, গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। সবচেয়ে ছোট আদরের সন্তান এষা, সে যে কোনো কিছু নিজে করে উঠতে পারে, আগে কখনো ভাবতে পারেন নি তিনি। এখন দেখলেন সময় এলে সেও সব কাজেই হাত লাগাতে পারে।

ঝি চাকরের কোনো খোঁজখবর রাখা দরকার মনে হয়নি।

অসুখের ঘোর কেটে আসতে ধ্যানেশবাবু টের পেলেন পরিচর্যায় হরিয়ারও অংশ আছে, এবং সেটা গৌণ নয়।

দুপুরের ছেলেমেয়েরা কলেজ স্কুলে গেলে দরজার পাশে ঠায় বসে থাকে হরিয়া, উসখুস করে উঠলে এগিয়ে আসে। হয় জলের গেলাস, নয়ত পিকদানি, নয়ত চেম্বারপট, যেটা যখন দরকার সামনে এনে ধরে। ঘড়ি ধরে দুপুরের দু'খোরাক ওষুধ খাওয়ায় একটায়, তিনটেয়।

মেয়েরা ফিরলে চা কফি যা করবার করে। ফাইফরমাশে হরিয়ার পরমোৎসাহের কথা আগে বলেছি। উন্মুখ হয়ে থাকে ধরা কি এষা ফল, বিস্কুট, রুটি কিছু আনতে ফরমাশ করে কি না।

ধ্যানেশবাবু শুনেছেন সাইকেল চড়া শিখে নিয়েছে হরিয়া। কাছের দূরের যাবতীয় কাজে ফাঁক পেলেই সাইকেল ধরে টানে। ছেলের কাছে সে জন্যে তাড়াও কম খায় না, শুনতে পেয়েছেন।

জানতে পেরেছেন, রান্নার কাজ ধরা একাই করে। ওর পরীক্ষার পড়ার কাজে ক্ষতি হচ্ছে, জেনেও নাচার তিনি। সক্ষম থাকলে অনেক ঘরের কাজে তিনি নিজেই অংশ নিতে পারতেন, কিন্তু নিরুপায়। দেখে যাওয়া ছাড়া কিছু আর করবার নেই তাঁর—হাজার ইচ্ছে থাকলেও।

এষার কাছে খবর পেলেন, রুটি তৈরি ইত্যাদি কাজ হরিয়া শিখে

নিয়েছে, প্রায়ই করে, এবং ভালো করে। ধরার কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করে হরিয়া। ফলে হরিয়ার দোষগুণ সম্বন্ধে ধরা ওয়াকিবহাল হয়েছে সম্প্রতি।

শুয়ে শুয়েই লক্ষ্য করেন কাজের পারিপাট্য। একবার বলা কাজ বারদিগর বলে দিতে হয় না। টেবিলঝাড়া, বিছানা তোলা, ধ্যানেশবাবুর হাত ধরে বসবার ঘরের বিছানায় দিনের মতো শুইয়ে দেয়া, ডাক্তার এলে ইঞ্জেকশনের ছুঁচের জন্যে জল ফোটানো, সেরামের ভাঙা কাঁচ রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে আসা—এইগুলো ধ্যানেশবাবুর চোখে পড়ে। যথাযথ হয়ে যায় এসব কাজ।

পারিপাট্য দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করে হরিয়া। আলস্যহীনতা দিয়েও। লক্ষ্য করেছেন যে ওর থেকে থেকে পূর্বতন সঙ্গীসাথীর সাথে আগে যেমন বেরিয়ে যাওয়া ছিল অজান্তে—এখন সেটা কমে এসেছে।

নতুন স্বাদ পেয়েছে খেলাধুলোর। আর পাঁচটা ভদ্রলোকের ছেলেদের সাথে বাসার সামনের মাঠে ক্রিকেট খেলে বিকেলে। তাতেও পটুতা দেখায়। যে কোন কাজ, বাড়ির কি বাইরের, আবশ্যকীয় কি খেলার সবতাতেই সমান মনোনিবেশের ক্ষমতা রাখে ছোকরা। মনোনিবেশের সাথে কর্মনিষ্ঠা যুক্ত হলে সাফল্য আসেই—গুরুতর প্রতিবন্ধক না থাকলে।

ধ্যানেশবাবুর সেরে উঠতে প্রায় দুমাস কেটে গেল। হাসপাতালে ছেলে বিপদমুক্ত হবার পর গিন্নিও ফিরে আসেন দেশান্তর থেকে। হাসপাতালে বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হবে জানা গেছে। বিদেশ থেকে মাথার কৃত্রিম অংশ আনিয়ে লাগাতে হবে, সেও সময়সাপেক্ষ। দুর্ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কার বিপদবোধ ও ভয় কেটে গিয়ে এখন দুরবস্থাকে সহনীয় করবার মনোভাব এসে গিয়েছে—সুদিনের আশার আলো দেখা যাচ্ছে, শুধু প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

গিন্নি ফিরে আসার পর বাড়ির অবস্থা আগের মতো, অর্থাৎ

তর্জন চেঁচামেচি ও ঝঞ্ঝাট ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

একটুকরো জমি কেনা ছিল কাছাকাছি। বাস্তুপূজা করাই হল, এইবারে ভিতগড়া শুরু হল। ইঁট সিমেণ্টের ঝামেলা দস্তখৎ ধ্যানেশবাবু মেটান, খবরদারির ঝক্কি পোয়ায় ছেলেমেয়ে। ঠিকেদার মিস্ত্রী মজুর খাটানো ব্যাপারে ধ্যানেশবাবু সাক্ষাৎ অংশ নেন না। অপারগ বলে নয়, শারীরিক অসমর্থ বলে। তার ওপর কিছু সুস্থ হয়ে উঠতেই রুজিরোজগারের ধান্দায় ব্যাপৃত হতে হয়। দু-আড়াই মাসের অকর্মণ্যতায় সঞ্চয়ের টাকায় টান পড়ে গেছে। বয়স বাড়ার সাথে খরচের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে, যুগের সাথে তাল রেখে ছেলে-পুলে নিয়ে স্বল্পবিত্তের সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

পেরে উঠলে খাটতে পেছপা নন ধ্যানেশবাবু। ফলাফল নিরপেক্ষ হয়ে খাটুনির কথা ভাবতে আত্মপ্রসাদ হয় বটে, তবে সংসার চলে না। গীতার উপদেশের সাথে দৈনন্দিন চালডাল তেলনুনের সংঘর্ষ বাধাতে চান না তিনি।

শুধু ভরসা রেখে কাজ করে যান। আত্মপ্রত্যয়ে আস্থা রাখেন, নিয়মিত পরিশ্রমেও কম আস্থা রাখেন না। দুয়ে মিলে চলে যায় ভালোভাবেই।

নতুন বাড়ি আধা তৈরি হতেই উঠে আসেন ওঁরা। বেঢপ লম্বাটে জমি, এক কোণায় বাড়ি তুলে দক্ষিণটা ফাঁকা রেখেছেন ধ্যানেশবাবু। ছ্যাঁচা বাঁশ আর রাংচিতে দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দি বানিয়ে বানিয়ে দু'দশটা শখের গাছও পুঁতেছেন। কিন্তু ছাগলের উৎপাত যদি বা রোখা যায়, হনুমানের উপদ্রব বেড়ার বাঁধ মানে না। হরিয়া ভরসা, সে তার ধনুক আর গুলতি দিয়ে যদ্দূর পারে হনু তাড়ায়। কিন্তু বীর হনুমানেরা অল্পবয়সী ছেলে কিংবা স্ত্রীলোক দেখলে আদৌ ভয় পায় না, বিকট মুখ ভ্যাংচায়—তেড়েও আসে মাঝে মাঝে।

বাগান তৈয়ারিতে হরিয়া তাঁর দোসর হয়ে ওঠে। আগে ভাড়াটে বাড়িতে ছিল আগাছা লাগানোর ঝোঁক, এখন এ বাড়িতে তাঁর বাছাই করা চারা পোঁতা, জল দেওয়া, মাটি নিড়োনো—সব তাতেই হরিয়া আগুয়ান। কখন যে বাড়ির যাবতীয় কাজ, গরুর তদারক সেরে সময় করে উঠতে পারে, বুঝে উঠতে পারেন না ধ্যানেশবাবু। ধীরে ধীরে তাঁর মনে হরিয়ার ওপর নির্ভরশীলতার ভাব জাগে, তবে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না।

কারণ থাকে। খুচরো রেজকি এদিক-ওদিক হলে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ধরা একাদ্দিন দেখেছে দেরাজে চাবি লাগিয়ে রেখে ধ্যানেশবাবু বাথরুমে গেলে হরিয়া দেরাজে হাত দিয়েছে। নেয়নি, অথবা নিতে পারেনি কিছু কিন্তু হাতটানের অভ্যাস যায়নি। তার পর থেকে চাবি বিষয়ে ধ্যানেশবাবু নিজে সব সময় পেরে না উঠলেও ধরার সতর্ক দৃষ্টি থাকে কখন কোথায় ফেলে গেলেন তার ওপর। হরিয়া কি টের পায় না? পায়। কিন্তু ভেতর থেকে অদৃশ্য কোনো শক্তি ওকে ছিঁচ্‌কেমির দিকে ঠেলে।

গিন্নি সম্প্রতি ধুয়া তুলেছেন, হরিয়া নাকি খাবার, মিষ্টি, বিস্কুট ইত্যাদি ফাঁক পেলেই মুখে পুরে দেয়। এটা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করেন না ধ্যানেশবাবু। নিজের ছেলে বয়সের কথা মনে পড়ে। এখনো, এ বয়সে মাঝে মাঝে বরাদ্দর বাইরে এক-আধটা সন্দেশ যে আলগোছে মুখে ফেলে দেন না, এমন নয়।

অর্থাৎ সোজা বাংলায়, হরিয়ার ওপর কৃপামিশ্রিত স্নেহের ভাব তাঁর মনে বাসা বাঁধে।

যে কোন সংসারের জীবনযাপনের জালে যারা জড়িয়ে পড়ে তারা একদিন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। হরিয়াও ধীরে ধীরে তাই হয়ে উঠছে অনুভব করেন ধ্যানেশবাবু।

হরিয়ার বয়েস এখন ষোল-সতেরো। এখন তার সঙ্গীসাথীরা প্রায় সবাই আশপাশের বাড়ির কমবয়সী ভদ্রলোকের ছেলেরা।

ছেলেরা সবাই ভদ্র, তা' নয়, বাউণ্ডুলে, রকবাজ, স্কুল-পালানো—এই জাতই বেশি। যুগের হাওয়ায় প্রায় সবারই গলায় হিন্দী ছবির গান, পরনে ড্রেনপাইপ আর টি' শার্ট। হরিয়া যেহেতু চাকর—তার বেশভূষাও তাই খানিকটা ভব্য এখনো আছে। গলায় গানের রেশ সামান্য শোনেন ধ্যানেশবাবু, তবে ধরা বলে যে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলা ছেড়ে 'কোই মুঝে জংলী কহে' তান ধরে।

এদিকে অন্য বিপদও দেখা দিয়েছে—সহৃদয় প্রতিবেশীদের হরিয়াকে ভাঙানোর অভিযান। তারা প্রথমে হাত করেছে ওর সৎ বাপ রিকশওলাকে। বুঝিয়েছে ও বয়সের ছেলে দিনমজুর খাটলেও মাসে ৫০্।৬০্ রোজগার করবে, আর টাকাটা বাপের হাতেই যাবে। বাপও টাকাটাই বোঝে। ধ্যানেশবাবু শুনেছেন ওর মাস মাইনে হরিয়ার হাতে পৌঁছয় না কখনো—ওর বাপ এসে নিয়ে যায়। বাপ পাকেপ্রকারে আরো টাকা নেয়। হরিয়ার মায়ের অসুখ, সাহায্য দশটাকা। একটা নতুন রিকশ আগাম বায়না দেবে, হরিয়ার বেতন থেকে আগাম পঁচিশ টাকা। এমনি লেগেই আছে।

ওদের জাতভাইদের মধ্যে খুড়ো জাতীয় একজন পচাইয়ের দোকানে কাজ করে। সে এসে টানে,—মাসে পঁচিশ টাকা পাবি। এখানে'ত পাস মোটে দশ।

প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে ভাঙচি আসে,—চলে আয় আমার এখানে, বারোটাকা দেব।

প্রলোভনের আর অন্ত নেই। কিন্তু হরিয়া কি জানি কেন ভেড়ে না। ধরা বলে যে ও এ বাড়িতে ছেলেমেয়ের শামিল হয়ে গেছে, একটু মার্জিত জীবনের স্বাদ পেয়েছে, চাকরের মতো হেনস্থায় থাকে না, অভাব বলতে সত্যিই কিছু নেই, খাওয়া পরা জামা-কাপড় ছেলেমেয়েদের সাথে সমান করে পায়। ওর আদৌ ইচ্ছে নেই বেশি রোজগারে মজুর হতে কি পচাই বিক্রি করতে। সে এটা

বেশ জানে যে ও সব কাজে খাওয়া পরা নেই, আছে নগদ রোজগার আর সে রোজগারের পাই পয়সা নেবে তার বাপ।

বেশি মাইনের প্রলোভন ওকে টলাতে পারে না, তবে বয়োধর্মে বারমুখি মন হয়েছে, নগদ পয়সা হাতে পায় না, যদ্দূর সম্ভব হাতে পায়ে ধরে ধরার কাছ থেকে নেয়, খালি সিনেমা দেখার জন্য। আর অন্য কোনো বাতিক নেই সম্প্রতি।

ওদের সমাজে অপরাধবোধ জিনিসটা বড়ো শিথিল। সরকারী পুকুরে লুকিয়ে মাছ ধরা কি কারো বাড়ির গাছের ফলফুলুরি সংগ্রহ করা দোষের মনে করতেই পারে না, চোখে পড়লে ধ্যানেশবাবু বকেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হয় এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বাড়ির আর সবাই গ্রাহ্যে আনেন না।

রাত একটার ঘড়ি বাজাতে চমকিত হলেন ধ্যানেশবাবু। ভোর পাঁচটার ট্রেনে বাইরে যেতে হবে তাঁকে। বাপরে, হরিয়ার পূর্বাপর কাহিনীর জাবর কেটে কখন যে এত রাত হয়ে গেছে টেরও পান নি তিনি।

সুটকেস গোছানোই আছে। রিকশ বলা আছে, ভোর রাতে এসে ঘন্টি বাজাবে। তা ছাড়া ক'টায় উঠতে হবে, মনস্থ করে শূলে ঠিক ঘুম ভাঙে তাঁর।

টাকাকড়ি জামার বুক পকেটে রেখে জামা খুলে টাঙিয়ে রাখেন। নয়া পয়সা রেজকিতে টাকাখানেক পাশের পকেটে রাখেন—একটি আধুলি রাখেন রিকশ ভাড়া দেবেন বলে। চাবি বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়েন তিনি। ঘুমের আগে মার খাওয়া হরিয়ার ক্লিষ্ট মুখ কল্পনায় চোখে ভাসে, নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হয়।

ভোর ঘুম ভাঙলে বাথরুমে যান, কিন্তু হরিয়াকে ডাকেন না। একটু চা খেয়ে যেতে পারলে বেশ হ'ত, কিন্তু থাক।

বাথরুম থেকে ফিরতে দেখতে পান হরিয়া তাঁর ঘর থেকে দেশলাই নিয়ে বেরোচ্ছে—স্টোভ ধরাবে।

বলে,—চা, না কফি ?

—যা হয়, তাড়াতাড়ি কর, বেশি সময় নেই।

ঘরে ঢুকতেই হরিয়ার থতমত ভাব তাঁর চোখ এড়ায় নি। কিন্তু আমলে আনেন না। কাপড়চোপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে বসেন, হরিয়া চা এনে দেয়।

খেতে খেতে, যেন ঘুষ দিচ্ছেন, এমনি সুরে বলেন,—এই টাকাটা রাখ। আনা আষ্টেকের সরষের খোল এনে গোলাপ গাছগুলোর গোড়ায় দু-চামচ করে দিবি। আর ইউক্যালিপটাস চারাগুলোতেও, বুঝলি ?

হরিয়া ঘাড় নাড়ে। সুটকেস তুলে দেয়, রিকশতে ছাতা এগিয়ে দেয়। রাতের নির্যাতনের ছাপ চোখে মুখে থাকলেও সহজভাবে যে হরিয়া এসব কাজগুলো করে, তার জন্য যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

সরষের খোলের চেঞ্জটা কি হবে, তার উল্লেখ করেন নি তিনি। যদি ফেরত না দেয়, আর মনে মনে সেটাই বোধ হয় চান,—না দিক। আহা, কালকে অমন মার খেয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছে সুটকেস-ছাতা নিয়ে নেমে পড়েন। রিকশ ভাড়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে চেঞ্জও বার করেন।

চক্‌চকে আধুলিটি নেই।

হরিয়ার থতমত ভাব, রাত জেগে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন, সব মনে পড়ে যায় এক সাথে আশ্চর্য একটুও রাগ হয় না তাঁর। রিকশ ভাড়া চেঞ্জ থেকে মিটিয়ে টিকেট ঘরের দিকে যেতে যেতে হোহো করে হেসে ওঠেন আপন মনে। নিশ্চিন্ত প্রশান্তির হাসি। মুক্তি-স্নানের হাসি।

একবার কেবল ভাবেন, সরষের খোলের চেঞ্জটা ফেরত দিতে বললে হোতো।

তারপর, আবার ক্ষমায় ভরে ওঠে মন।

স্বপ্ন

ট্রেন চলেছে ঢিমে তালে। দেহাতী গাড়ি, সব স্টেশনেই ধরে।

বিপিনবাবু ফাঁকা কামরায় একাই আরোহী। মনটা ভালো নেই, ভাবতে ভাবতে চলেছেন।

মরতে একদিন হবে, তাই বলে রোজ মরব কেন? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন, সদুত্তর খুঁজে পান না বিপিনবাবু।

বিপিনবাবুর বয়স পঁচাত্তর ছাড়িয়েছে, সুস্থ সমর্থ আছেন এখনো। ওল্ড মডেল গাড়ির নাট্ বল্টু ঢিল হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু ঠুকৃঠাক্ মেরামতেই আবার চালু হয়। বিপিনবাবু এখনো চালু আছেন।

এককালে দু'একটা সাহেব মেরেছেন, কলে-কৌশলে ফাঁসীকাঠ এড়িয়ে এসেছেন। জেল খেটেছেন বহুবার, সে সব আর মনেও পড়ে না। কখনো সন্ত্রাসী, কখনো কংগ্রেসী, কখনো নির্বিরোধী। একতাল পারার মতো মুঠো পিছলে বেরিয়ে এসেছেন সব বারই। দেশের জন্যে শহীদ হবার বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে গেছেন বটে, এখন বেঁচে শহীদ হয়ে আছেন। দু'মুঠো খাওয়ার সংস্থান আছে, কাজ কর্মও করেন একটা কিছু, কিন্তু অগ্নিযুগের বিপিন বাঁড়ুজ্যে নেই, সে কথা নিজে বিলক্ষণ জানেন, আর জানেন বলেই বেঁচে থেকেও নিজের কল্পিত শবের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসেন।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে। বিদেশী শাসনের দিনে একটা খুনের পর দীর্ঘদিনব্যাপী সন্ত্রাস ও আতঙ্কের কালো ছায়া দেশের আবহাওয়া থমথমে করে রাখত। গা ঢাকা দেবার দল যদ্দূর সম্ভব পালিয়ে বেড়াত, এক আধজন ধরা পড়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলত। হাসিমুখে ফাঁসী যেত তারা, নির্ভয়ে, নবজীবনের জয়গান গেয়ে। অত্যাচারী শাসক মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে পরাভব মানত, এই মনে হোলো তাঁর। হ্যাঁ, মানত। অপরাধবোধ

পক্ষাঘাতের মতো সংক্রামিত হয়েছিল অত্যাচারীর মনে। একদিন পঙ্গু হয়ে এসেছিল সে মন। নিঃসাড় হয়ে এসেছিল প্রভুত্ববোধ।

তারপর পঁচিশ বছর আগেকার দিনগুলো। লড়াই এল হুন তাতারের মতো অতর্কিতে ঘরের দোরে! কোথায় থামলো লড়াই ভগবান জানেন, ইংরেজ পালালো। দেশময় রয়ে গেল দাঙ্গাহাঙ্গামা খুন-জখমের জের। অসহায় একটা মৃত্যু যেন লক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। লুঠতরাজ, রাহাজানি, দিনে ডাকাতি, খুনখারাবি ডালভাত হয়ে গেল।

কিন্তু দুর্ভাগা দেশে একটা সার্থক মৃত্যুও হোলো না, যে মৃত্যু অন্তত একটা সার্থক জন্মের সূচনা করবে। কালান্তকের পায়ের তলায় পোকামাকড়ের মতো মানুষ মরতে শুরু করল, আজও মরছে, কিন্তু নবজাতক কই?

যেন দেশব্যাপী সব আশা উদ্দীপনার জহরব্রত পালন করা হয়ে গেছে—পড়ে আছে রাশি রাশি ছাই—কোনটায় ঈষৎ স্ফুলিঙ্গ আছে হয়ত। বেশির ভাগই নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপ। কবেকার পড়া কবিতার ক'টা লাইন মনে পড়ে,

Age shrinks our hearts to ape-like dust···that ape
Looks through the eyes where all death's chasms gape
Between ourselves and what we used to be.
My soul, my Lazarus, know you not me?

মরতে একদিন হবেই, কিন্তু রোজ মরব কেন? আজ স্বাধীন দেশে প্রতিটি মুহূর্ত নির্ভয়ে আত্মস্থ হয়ে বেঁচে থাকব না কেন? জন্মমৃত্যুর মধ্যেকার জীবন তিনটে-পাঁচটার শোয়ের মতো নিরবচ্ছিন্ন নির্বিরোধে চলবে না কেন? কেন, কেন ফিল্ম কেটে যাবে, থেকে থেকে আলো নিভে যাবে?

বয়স হলে জীবনবোধ ঝিমিয়ে আসে? মিছে কথা।

Do the Dead know that metamorphosis
When the appalling lion-claws of age
With talons tear the cheek and heart, yet
rage
For life devours the bone, a tigerish fire ?

১৯৩০ সালে পুলিশের গুলি খাওয়া শিবেন আর বাণেশ্বরকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা-ধলেশ্বরী পেরিয়ে কলাকোপা-নবাবগঞ্জ হয়ে দোহারের কাছে পদ্মায় স্টীমারে তুলে দেওয়ার কথা মনে পড়ল বিপিনবাবুর। ঢাকা থেকে ঘুর পথে নদীনালা হয়ে দোহার—আড়াই দিনরাতের পথ। বাণেশ্বর মরতে চায় নি, কিন্তু রাস্তায় মরে গেল। তার দেহ সমর্পণ করা হোলো ধলেশ্বরীর উত্তাল তরঙ্গে। শিবেনকে স্টীমারে তুলে ফেরবার সময় শিবেন বিপিনবাবুর হাত ধরে বলেছিল,—যদি বেঁচে যাই, আবার মরতে আসব, দেখা হবে। থাকিস।

যেন মহাসমুদ্রের ঢেউ। এই মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার উঠ্‌ছে। আবার মিলিয়ে যাবে জেনেই উঠ্‌ছে। উঠতে চাইছে।

হাসি পেল হঠাৎ বিপিনবাবুর, আজ দেশে না খেয়ে লোক মরছে। একদল প্রচুর খাচ্ছে, আর যারা বেশির ভাগই না খেয়ে মরছে তাদের খাবার জিনিস নিয়ে তেজীমন্দি খেলছে। সোনারুপোর কারিগর, সন্দেশ তৈরির ময়রা জাত-ব্যবসা ছেড়ে কেরোসিন তেলের রিটেল ডিলারশিপের জন্যে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছে—যার হোলো না, তাদের মধ্যে সপরিবারে গলায় দড়ি দিয়ে মরার খবরও বেরোচ্ছে কাগজে। তিনহাজারিদের চারহাজারি ওমরাহ্ বানানো হচ্ছে, দেড়শ দুশোর লোককে পাঁচটাকা ভাতা বাড়ানো হচ্ছে।

পাঁচশো বছর পর যাতে দেশে অভাব অভিযোগ অনটন না থাকে তার পরিকল্পনায় লক্ষ, ক্রোর, অক্ষৌহিণীর অঙ্ক পাঁচটা হিমালয়ের চূড়া ছাড়িয়ে গেল—পৃথিবীর যাবতীয় দেশের কাছে ঋণের অঙ্কে দেশের মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই মোটা অঙ্কের

অংশভাগী শেয়ালকুকুরের দল দেশব্যাপী মহাশ্মশানে মড়ার মাংস-হাড় নিয়ে খাওয়া-খাওয়ি শুরু করে দিয়েছে।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প মনে পড়ে গেল বিপিনবাবুর। নারকেল গাছের ডগায় ভাতের হাঁড়ি ঝুলিয়ে গাছের গোড়ায় উনুন জ্বালানোর গল্প। আঁচ উঠবে, ডগা পর্যন্ত পৌঁছবে, ভাত সেদ্ধ হবে—তারপর খাওয়া-দাওয়া। লম্বা মেয়াদী ফলারের প্রত্যাশায় আজকের জন-সাধারণ ধুঁকছে। সমাজতন্ত্রের সাধক যেন এক কাপালিক। সমাজকে সুদূরে পরিহার করে পঞ্চমুণ্ডির আসনে শবসাধনায় বসেছে, মহা আশঙ্কা ঘোর অন্ধকারে থমথম করছে। সন্ত্রস্ত দ্যুলোক ভূলোক যেন অপেক্ষমান, যেন করালবদনী অসিপাশিনী নরমালা বিভূষণা ভীষণা বিলোলরসনা সর্বসংহারিণী শক্তিমূর্তি অচিরেই ভয়ঙ্কর গর্জনে দিকমণ্ডল পরিপুরিত করে আবির্ভূতা হবেন। দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, কিছু নাই, কল্পনা—কিছু নাই, কিছু নাই। আমিত্ববোধও অবলুপ্ত।

সভয়ে শিউরে ওঠেন বিপিনবাবু। তাঁর মনে হোলো সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে, চেতনা স্তম্ভিত,—সব অভিব্যক্তি বোবা হয়ে এসেছে।

উত্তেজনার পরেই স্বপ্নাবেশে যেন ঝিমিয়ে পড়েন তিনি। স্বপ্ন। সুপ্তি নয়,—আর এক জগতে জেগে ওঠা। সে জগতে স্থানকাল-পাত্রের বিভেদ কি ব্যবধান নেই—সব অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায় স্বপ্নরাজ্যে—সব অঘটন অনায়াসে ঘটে যায়।

স্বপ্নে দেখলেন নিজেকে তিরিশ বছরের যুবা, অকুণ্ঠ প্রেমে বুক ভরা, অদম্য কর্মোৎসাহ শিরায় টগবগ করছে। প্রেয়সী স্ত্রী, প্রাণাধিক ছেলেমেয়ে, ভব্য প্রতিবেশী, কৃতকর্মে সন্তুষ্ট কর্মরত তিনি নিজে, আর রাম শ্যাম হরি, সবাই। সবাই স্বাধীন, শুভবুদ্ধির অনুশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্যপাট—আইন অমান্য নাই, অভাব অভিযোগ নাই, দ্বেষকলুষ ভীত সাপের মতো নিজ নিজ বিবরে পলায়মান।

অপরের সৌভাগ্যোদয়ে সুখী, অপরের অবস্থাবিপর্যয়ে সহানুভূতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ জনসাধারণ, যার যে দেবতা ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রত্যেকেই পূজাপরায়ণ। সমষ্টির হিতার্থে মুষ্টিমেয়ের আত্মপণ। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাচুর্যের পেছ'ন কেউ ধাবমান নয়, আবশ্যকের অতিরিক্তের আকাঙ্ক্ষাও কারো নেই। ব্যবসায়ী, চাষী, শিল্পী, কবি, রাজপুরুষ, নরনারী স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে নিজ অধিকারে সঞ্চরণশীল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে ট্রেন থেমে গেল। মুষলধারে ঢিল পাটকেল পড়ছে, পটাপট বন্দুকের আওয়াজ কানে আসছে। উত্তেজিত কলকোলাহলে দিক মুখর।

স্বপ্নের জগৎ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। দরজা খুলে বৃদ্ধ বিপিনবাবু নামলেন। ট্রেন স্টেশনেই পৌঁছেছে বটে, কেষ্টনগর স্টেশন।

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। বেরিয়ে যেতেই কে একজন বলে উঠ্‌ল—ওদিকে যাবেন না বাবু, ট্রেন পোড়ানোর দলে আর পুলিশে বেধেছে—ঢিল, পাটকেল, গুলি চলছে।

সংবিৎ ফেরবার আগেই সংবিৎ হারালেন বিপিনবাবু।

বোমা পড়ল

বুদ্ধিসুদ্ধি সব ভোঁতা মেরে গেছে, ধন্দ-ধরা লাগছে অনিমেষের। মাথার ঘিলু পর্যন্ত তেষ্টায় শুকিয়ে উঠেছে, কি তেষ্টা, কি তেষ্টা!

নিজেকে দেখে নিল একবার। পোশাক পরিচ্ছদ ফিট্‌ফাট, টাইটা খোলা, একটা দিক পিঠের দিকে ঝুলছে। বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে, ডান হাত বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিল। ভেতর পকেটে ব্যাগ ঠিক জায়গাতেই আছে।

খুলে কি হবে। টাকাকড়ি হয়ত আছে, নয়ত নেই, না থাকলে হাজার ভাবলেও এখন আর গজাবে না। তবু বার করল ব্যাগ, এক ভাঁজ খুলতেই নোটের তাড়া চোখে পড়ল। কত, গোনার দরকার কি? Sufficient unto damnation! পাতলা ঠোঁটের কোণে হাসির চিলতে উঠেই মিলিয়ে গেল। উঠিয়ে রাখল ব্যাগ আবার যথাস্থানে।

নেহাতই অভ্যাসবশে ডানহিল পাইপটা টেনে বার করল, লতানো নলের মুখে কলকে ভরা তামাক। দেশলাই জ্বালবার আগেই এরিনমোরের সুঘ্রাণ নাকে এল। সুবাসিত তামাক, ঠিক আউটডোর নয়। ম্যান্‌লি নয়। ধরালো না, পাইপ ফিরে পকেটে পুরল।

বাঁ পকেট থেকে তোবড়ানো ক্যামেলের পকেট বার করে কাঁপা-কাঁপা আঙুলে ঠোঁটে গুঁজল অনিমেষ। দুটো সুখটান দিয়ে ভারি তৃপ্তি পেল। ঐটুকুই। তার পর থেকে ঝুলতে লাগল সিগারেটটা সুতলির মতো ধোঁয়ার রেখা ছাড়তে ছাড়তে ঠোঁটের কোণে।

যা কিছু করছে ও, কিছু যেন নিজে করছে না। ও যেন পুতুল, ওস্তাদ খেলুড়ে আড়াল থেকে সুতো টেনে খেলাচ্ছে ওকে। ও মজার মজার করে হাত পা ছুঁড়ছে মাত্র।

শুধু আকণ্ঠ তেষ্টাটা নিজের, সুখটানের তৃপ্তিটুকু নিজের।

কখন থেকে পথ হাঁটছে মনে পড়ছে না, বেশিক্ষণ নয়, বা হয়ত অনেকক্ষণ। হাঁটার বিরাম নেই। এখন ত হেস্টিংস স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজছে, বন্ধ হয়ে আছে? না বন্ধ হয় নি, খুলে দম দিয়ে নিয়ে আবার পরল ঘড়িটা—কাঁচে একটা চিড় খেয়েছে না? বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে পরখ করে নিল, ফাটা নয়, শুধু স্ক্র্যাচ। মজবুত ঘড়ি, মোভাতো ক্রোনোমিটর, সহজে ঘায়েল হয় না।

বণ্ডেড ওয়্যারহাউসগুলো বাঁয়ে রেখে পুরোনো মিণ্টমুখো চলছে অনিমেষ। ভূতে পাওয়া ধন্দ-ধরার মতো। মগজে জ্ঞানের ঝিলিক দিচ্ছে না, তা নয়। সে শুধু পা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটা তীব্র পিপাসার। বুক চোখ জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

অথচ এ অঞ্চলে তৃষ্ণাহরা পানীয় কোথায় যে পাওয়া যাবে তাও সঠিক জানা নেই। জল নয় যে রাস্তার কলে পাবে। দুধ নয় যে হাওড়াপুলের মোড়ে পাবে।

যা খুঁজছে তার সরকারী দোকান আটটার আগে খোলে না, সেও সাহেব পাড়ায়, এ পাড়ায় নয়। ভাবছে নিমতলায় যারা মড়া পোড়াতে আসে তারা হয়ত সন্ধান দিতে পারে। হয়ত সেখানেই স্পিকিজি মিলে যাবে একটা। যা হোক হবে।

হঠাৎ জ্ঞানোদয় হয়ে একটা গানের কলি মনে পড়ল, লজ্জায় জিভ কাটল অনিমেষ, চল্লিশ বছরের বুড়ো মাতাল অনিমেষ। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে। ছি ছি।

কিছু যে আবছা মনে পড়ছে না, তা নয়। কাল রাতে অফিসে এয়ার রেড ডিউটি ছিল। কারেন্সিতে বোমা পড়বার পর থেকে সরকারী অফিসগুলোতে ডিউটি চালু হয়েছে। এক বোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে গিয়েছিল, আট দশটা স্যাণ্ডউইচ। স্যাণ্ডউইচ বরং দু'চারটে পড়ে আছে ভোরে দেখল। বোতলে এক ফোঁটা তলানিও নেই।

রাস্তার ঠিক মাঝখানটা দিয়ে চলেছে অনিমেষ। ইয়া চাঁই চাঁই পাথর বাঁধানো রাস্তা। ট্রাম চলতে শুরু হয় নি, শুধু রাস্তা-ধোওয়া হোসপাইপের তীব্র ধারা তাকে এড়িয়ে আগপাছ ধুয়ে চলেছে। মাথা বুকে ঝুঁকে পড়েছে, তাকাচ্ছে না কোনো দিকে। ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত শোলোক শোনা যাচ্ছে গঙ্গার দিক থেকে। পোস্তার কাছাকাছি আসতে ঠেলার ঘড়ঘড়ি। অনিমেষের লম্বা শরীর দুটো লম্বা পায়ে ভর দিয়ে মামুলি মানুষের চারগুণ বেশি রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও হাঁটছে সে ঢিমিয়ে।

নিমতলা ঘাটে পৌঁছে এক লাকড়ির আড়তের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করল অনিমেষ,—হ্যাঁরে, এখানে বিলিতি মদ পাওয়া যাবে?

সপ্রতিভভাবে ছোকরা জবাব দিল,—এজ্ঞে এখেনে লয়, সোনাগাছির মোড়ে পাবেন।

—সে আবার কোন দিকটায়? কতদূর?

—দূর বেশি নয়। হুই পূবের গলি বরাবর গেলে চিৎপুর, তা' পর ডানে মোড় নেবেন। দু' কদম গেলেই বাঁয়ে দুগ্‌গো মিত্তিরের গলি, ওইটেই সোনাগাছি। বিলিতি মাল কত্তা মোড়ের ওপরই আলিন হোটেলে পাবেন।

বেলা প্রায় স'ছটা, হনহন করে পা চালায় অনিমেষ। রাস্তার হদিস ভোলে না। ঠিক পৌঁছে যায় অ্যালেন হোটেলে। বড় হোটেল, কিন্তু ও হরি, দরজাকবাট সব বন্ধ। অত ভোরে খোলা থাকে কখনো।

বহু ডাকহাঁকেও কেউ দোর খোলে না। সামনেই যে রাস্তা, তাই ধরে আবার পুবমুখো পা চালায়।

—কে র‍্যা ড্যাকরা, চোকের মাথা খেইছিস নাকি র‍্যা? দিলে-দিলে—গঙ্গাজলটুকু ধাক্কা দিয়ে ফেলে—ওরে ও গনশা, ইদিক আয় বাছা, সাত সকালে এ কোন মাতালের খপ্পরে পন্নু গো—

সংবিৎ ফেরে অনিমেষের। সত্যিই ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে একটি

মাঝবয়সী স্ত্রীলোককে। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছে, কাঁখে ছোট্ট ঘড়া, মাথায় লাল ভিজে গামছা। হাত জোড় করে অনিমেষ। বলে,—মাপ করবেন, সত্যিই আমি দেখতে পাই নি। অনেকটা আপন মনেই মাথা নিচু করে যাচ্ছিলাম—

স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই অনেক দেখেছে। অনিমেষের কথায় ঘুরে সামনে এসে ভালো করে ওকে দেখে। বলে,—তাই ত! এ যে খোঁয়াড়ি কাটার চেহারা গো! রেতে যেতা ছেলেন, মিলল না সেতা দু'এক পাঁট?

—রাত্তিরে ডিউটিতে ছিলুম, আপিসে। আপনি ধরেছেন ঠিকই—মদের সন্ধানেই বেরিয়েছি। নিমতলায় ওরা বলল অ্যালেন হোটেল। সে ত বন্ধ। তাই হাঁটছিলুম যদি পানের দোকান-টোকানে—

এত ভোরে কি আর কেউ জেগে আছে গো বাবু। আসুন আপনি আমার সাথে—বলে হাত বাড়িয়ে অনিমেষের ডান হাত ধরে বলল,—আসুন—এই ত বাসা। দোতলায় উঠতে হবে, পারবেন ত? চেহারা দেখেই বুঝেছি ভদ্দর নোক, নেশার ঝোঁকে চলতে পারছেন না। কোন ভয় নেই আপনার—

স্ত্রীলোকটির হাত ধরে ধরে দোতলায় উঠলো অনিমেষ। একটি ঘরের কুলুপ খুলে, জানলা খুলে দিল মেয়েটি। ডাকল,—আসুন, জুতো খুলে ঐ ফরাসটায় বসুন।

ঘরটা বড়ই। এক দিকে দেয়াল ঘেঁষে খানচারেক পিঠ সোজা চেয়ার, একটা ছোট চৌকো টেবিলও আছে। টেবিলের ওপর একটা ছাইদান।

মাঝ বরাবর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তাই দিয়ে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। ওপাশে দেয়ালের গায়ে দুটো কাঁচের আলমারি, একটা ভর্তি নানারকম পুতুল, মাটির পাখি, চিনেমাটির পেলেট পেয়ালা কাঁচের ফুলদান, হরেক জিনিস। আর একটা ভর্তি কাপড়-চোপড়।

দেয়ালে টাঙানো রামকেষ্ট বিবেকানন্দ গান্ধীর ছবি, ডানাকাটা হুরী পরীর তস্‌বির আঁকা ক্যালেণ্ডার. তাও দু'চার বছর আগেকার। জানলাগুলোয় পুরোনো ডুরে শাড়ি কেটে পরদা টাঙানো।

অনিমেষ ঘরে ঢুকেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে বলল,— ব্রাণ্ডি পাওয়া যাবে? বিলিতি?

—যাবে না কেনে গো, দাম দিলেই পাওয়া যাবে।

—তবে এই নাও। এক বোতল ব্রাণ্ডি আর গোটা কত সোডা আনাও।

পার্সটা বার করে যে কখানা নোট উঠলো প্রথম ধাক্কায় ফেলে দিল ফরাসে। গুনলো না কত। পার্সটা আবার বুক পকেটে ঢোকাল।

—এ যে অনেক টাকা গো—অত কি হবে! কুড়িটে রাখলুম, এগুলো উঠিয়ে রাখুন।

—কত আছে আর?

—আরো চল্লিশ। ষাট টাকা ফেলেছেন ছুঁড়ে।

—ও তুমি রাখো। কথা কইয়ো না। ভালো লাগছে না। বলে চেয়ারে আড় হয়ে বসে লম্বা পা ছড়িয়ে অনিমেষ চোখ বুজল। হাত দিয়ে কপালের চুলের গোছা পেছনে ঠেলে দিতে দিতে মুঠোয় ধরে টানতে লাগল শক্ত করে।

স্ত্রীলোকটা দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় এসে ডাকল,—নন্দ, ও বাবা নন্দ, একটিবার শুনে যা না বাবা।

—যাই মৌসি, বলে সাড়া দিয়ে কে একজন নিচতলা থেকে ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো।

—কি মাঙ্‌ছো মৌসি,—

—এই যে নন্দ। টাকাটা ধর বাবা। এক বোতল বেলাইতি মানে অষুধের, মানে দাওয়াইকে বেরাণ্ডি এনে ফেলা বাবা, আর দুটো সোডা। যাবি আর আস্‌বি, বুঝলি?

পাড়ার চাকর বেশি কথা কয় না। টাকা নিয়ে যাবার আগে দরজা ফাঁক করে নন্দ ঘরের বাবুটিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল মাত্র।

ঘরে ঢুকে স্ত্রীলোকটি বলল,—বাবু একটু আরাম করে বিছানায় গড়ান। বেরাণ্ডি এলো বলে।

—আসুক। পরে হবে।

কপালের দু'টো দিক দপদপ করছে। শার্টের নিচে ঘাড়ে পিঠে অনেক সুড়সুড়ে পোকা চলাফেরা করছে। দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের কেষ্টঠাকুর হঠাৎ হেলমেট মাথায় জর্ম্মান ফৌজির মতো রাইফেল চার্জ করতে নেমে আসছে। মাথার ভেতর অনেক ঝিঁঝি পোকা ঝিঁঝিঁ না করে সুরে বেসুরে কি যেন আবোল-তাবোল গান ধরেছে।

খাড়া চেয়ারে আরেক কাৎ হয়ে বসল অনিমেষ। বলল,—তোমার নাম কি?

—সরলাবালা দাসী।

—আমি কিছুক্ষণ থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না?

—কিছু না বাবু। আপনি অষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেই শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। তা' পর যা করবার তাই করবেন।

—তুমি খুব ভালো। হাত ধরে নিয়ে এলে, ব্রাণ্ডি আনতে দিলে, তাড়িয়ে দিচ্ছো না,—

—মানুষের কদর বোঝা যে আমাদের পেশা গো বাবু, আমরা পেশাকর।

—তোমাকে চাকরটা মাসী বলল না?

—আমি এখন এই বাড়িটির বাড়িউলি। মেয়েমানুষ ভাড়াটে সাত ঘর। বলতে গেলে মালিক এখন ত।

—বুঝলাম।

কি বুঝল অনিমেষই জানে।

তারজড়ানো ১নং এক্‌শ আর সোডা নিয়ে নন্দচাকর ঘরে ঢুকল। কর্কস্ক্রু পেঁচিয়ে ফট্ আওয়াজ করে ফেলল। এক বোতল সোডাও খুলে দিল। দু'টো গেলাস আনতে যেতে সরলাবালা একটা আনলে। অনিমেষ চোখ বুজেই আছে।

—খাবার কিছু আনবো ?

—না না না—

—বুঝেছি। ও নন্দ, পাঁচটা টাকা রাখ বাবা। গণশার দোকান খুললেই গরম সিঙাড়া আর গরম জিলেপী এক টাকার আনবি। দু'টো টাকার বাজার করবি বুদ্ধি করে—আর এক টাকা তোর, আর এক টাকা ফেরত। বুঝলি ?

নন্দ চলে গেল।

কাঁপা কাঁপা হাতে গেলাসে ব্রাণ্ডি ঢেলে সোডা মেশালো অল্প একটু। একচুমুকে সেটা খেয়ে আবার ঢাললো। সেটাও একচুমুকে শেষ করে তৃতীয়টি ঢেলে, সিগারেট ধরালো অনিমেষ।

পাঁচ, বড় জোর দশ মিনিট। বাঃ, সব পরিষ্কার হয়ে আসছে। ব্রেন ক্লিয়ার।

পিঠের সুড়সুড়ে পোকারা পালিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের কেষ্ট-ঠাকুর কেষ্টঠাকুরই আছেন।

কোথায় এসেছে, এ কোন জায়গা, মেয়েটি কে, এসব আঁচতে আর বেগ পেতে হচ্ছে না। বেশ লাগছে অনিমেষের। সরলাটিও তো গিন্নিবান্নি গোছের ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে ওর।

জিজ্ঞেস করল,—তুমি ত খেলে না ?

—আমি ও সব আর খাই নে। পাঁচ-সাত বছর চব্বিশ ঘণ্টা গিলেছি, এখন পাঁচ-সাত বছর একেবারে ছাড়ান দিছি।

—হুঁ এখন হিসেবী বাড়িউলি হয়েছ। —এখন ত খাই।

—তা খান। বাবুর কি করা হয় ? বৌ ছেলেমেয়ে আছে ত ?

অনিমেষ ক্ষেপে ওঠে।

—তা শুনে তোর কি হবে রে মাগি !

বলেই লজ্জায় জিভ কাটে। বলে, —না না, ঠিক অমনি করে বলিনি। শোনো, আমি কে, আমার কে কে আছে, এসব শুনে তোমার কি লাভ বলো ?

—বুঝেছি। আর কথা কইতে হবে না আপনার। এখন ত মাথা সাফ আছে, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু গড়িয়ে নেন। দাঁড়ান, সিঙাড়া জিলেপি এসে গেছে, একটু মুখে দিন।

ছটো প্লেটে গরম সিঙাড়া আর জিলেপি ভাগ করে নিয়ে এল সরলা। আশ্চর্য, আধ ঘণ্টা আগে দাঁতে কুটোটি কাটবার কথায় গা বমি বমি করেছিল অনিমেষের, এখন ভর প্লেট সিঙাড়া জিলেপি সাবড়ে দিল রা'টি না করে। বলল,—জামা-কাপড় ছাড়বার দরকার নেই। এইটুকু খেয়েই আমি ঘুমোই একটু। তোমার রান্না-বান্না হলে তুলে দিয়ো। পারি ত কিছু খাব তখন আবার। টাকা আছে ত? আছে, বেশ।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, এই দিকটা বিছানা করে দিচ্ছি।

আলমারি খুলে নতুন সুজনী বালিশ বার করে ফরাসের একধারে বিছানা করে দিল। ছ'তিনটি তাকিয়ার দেয়াল তুলে জায়গাটাকে বেশ আলাদা দেখতে করে ফেলল সরলা। বলল,—এইবারে সব ঠিক হয়ে গেল। আপনি গেলাস ফুরোলেই, আর খাবেন না। শুয়ে পড়বেন। বোতল ত থাকলই, সোডাও আর ছ'টো আমি আনিয়ে রাখব। রান্না হলেই ডাক দেব, মনে থাকে যেন, সদর দরজার হুড়কো তুলে দিচ্ছি ঘরে, আমি ভেতর বারান্দায় রান্না করতে বসলুম। ভেতর থেকেও আমি শেকল তুলে রাখব, কেউ জ্বালাতে আসবে না আপনাকে।

ঘড়ি পার্স খুলে মাথার বালিশের তলে রেখে প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল অনিমেষ। মাথাটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসছে মনে হচ্ছিল। পরিষ্কার !

কাল রাত্রে আপিস বাড়িতে এয়ার রেড ডিউটি, সমস্ত রাত

টহল দিয়ে স্কোয়াডের কাজ দেখা, ফায়ার ফাইটার, ফাস্ট এড সাজ-সরঞ্জামগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখা, তার ফাঁকে ফাঁকে এসে মদ্যপান। মদ্যপান যেন নাক দিয়ে নিশ্বাস টানবার মতো একটা সুস্থ জৈবিক প্রক্রিয়া। অন্তত পানের সময় তাই। তারপর ভেতর থেকে অন্য একটা অনিমেষ জাগতে থাকে। সে কখন কি করে বসবে ভেবে আকুল হবার মতো মনোস্থৈর্য তার নেই। যে যা করবার করবেই। শুধু নেশা কাটার মুখে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আরো মদ, কোথায় মদের সন্ধান।

অথচ নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো ঘূর্ণিতে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে না। তার মনে হয় নোঙর ছেঁড়ে নি, না হয় ঘূর্ণির পাকে তেমন জোর নেই।

আর তা না হলে, একটা জ্যান্ত মানুষ অনিমেষ, নৌকোর উপমা তার বেলা খাটেই না। যদি খাটেও, তা হলে শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকা কোনো অভাব্য কর্ণধারের সদাজাগ্রত উপস্থিতিও মানতে হয়।

শেষেরটাই ঠিক, বোধ হয়। চোখ জড়িয়ে আসে।

হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বোতল থেকে দরাজ হাতে তিনপো গেলাস ভর্তি করে ঢকঢক করে চুমুক দেয়। গলা হয়ত জ্বলে, ও জ্বলুনি সয়ে গেছে। একটু মুখ বিকৃত হয়, বুক চেপে ধরে দু'চার বার এমনিই ঢোক গিলে, চিপতে গেলে আরো জ্বালা করে।

তারপর চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে। চকিতে একবার বাড়ির কথা, বৌ ছেলেমেয়ের কথা, মনে হয়। মনে হয় যেন তাদেরই কাছাকাছি রয়েছে সে। চৈতন্য হারাবার ক্ষণে দু'একটা প্রিয় নাম বেরোয় ঠোঁট থেকে।

ঘুম ভাঙে তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। জেগে উঠে অনিমেষ ধন্দ ধরে এক সেকেণ্ড বসে থাকে, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। গায়ে কোট পায়ে জুতো গলিয়ে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়।

একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক ফরাসের একটেরে গভীর ঘুমে। ঘরটা, পরিবেশটা, আবছা আবছা অনুধাবনযোগ্য হলেও, পষ্টাপষ্টি কিছু মনে পড়ে না বরং আগের রাতের অফিসে ডিউটি, বাড়ি ঘর, এই সব বেশি করে মনে পড়তে থাকে।

আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অনিমেষ।

ট্যাক্সি—বাড়ি—ব্যস্—এই ধান্ধা এখন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শোনে দোতলার আর এক ঘর থেকে কোনো অল্পবয়সী কণ্ঠের আওয়াজ।

—অ কোকিলে, দেকেচিস বষ্টুমী মাগীর কাণ্ড! সব ছেড়েছুড়ে বিবেগিনী হইচি! ভোর না হতে দশাসই বাবু, বোতল বোতল বেরাণ্ডি—ঘেন্নায় মরি ঘেন্নায় মরি বুড়ি মাগীর কাণ্ড দেখে—

কোকিলা নাম্নীটি বোধ হয় পদ্মাপারের। তার গলার জবাবও শোনা গেল—

—বাবুডারে ত ছ্যামরা দ্যাখ্‌লাম না, বুড়াই মনে লয়। পুরানো আলাপি সালাপি কিনা কেডা জানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—রেকে দে তোর পুরোনো আলাপি! আমারো ছ বছর কাটলো সরলা মাসির বাসায়, বাপের জন্মে দেখিনি একে। আর বুড়ো তোকে বলল কে রে—হেই জোয়ান না সেই জোয়ান। হ্যাঁ তবে, চ্যাংড়া নয়, আর বদ্ধ মাতাল—

—আমাগো কাম কি লো হেই সব কথায়। মাসি মাম্‌লত গুছাইয়া লইলেই অইলো—

খপ্পরে এসে গ্যাছে—ছাড়বে কি আর! বলে, কম পয়সা করেচে বুড়ী মাগী? নন্তবাবুকে বেহুঁশ করে বাড়িটা সুদ্ধো লিকিয়ে নিয়েছ্‌লো শুনতে পাই বিশ বছর আগে। টাকার অ্যাণ্ডিল এই বাড়িউলি, বুঝলি কোকিলে—তবু কি খাঁই কমল? আমাদের ঠেঁয়ে এক পয়সা কম নিয়েচে কখনো—

আর শুনতে পেলে না অনিমেষ—ততক্ষণে সদর রাস্তায় পৌঁছে গেছে। আর যা শুনল তার একটি বর্ণও বোধগম্য হোলো না তার।

গলি ছেড়ে চিৎপুর পৌঁছে সামনেই পড়ল ট্যাক্সি। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল ঢের টাকাকড়ি আছে। এর বেশি তখন সে তার মাথা খাটাতে নারাজ।

ট্যাক্সিতে উঠে বলল,—ভবানীপুর—জগুবাজার।

বাড়িতে এ অবস্থায় পৌঁছানো, এও নতুন নয় অনিমেষের। তার ওপরে রাত্তিরে ডিউটি ছিল—ফিরতে সকাল না হয়ে বেলা প্রায় তিনটে হোলো—এ আর এমন কি। থোড়বড়িখাড়ার দিন সেই ভাবেই কাটল। সন্ধের পর স্নান করে এসে ঘড়ি বাঁধতে গিয়ে দেখল ঘড়ি নেই। আঁতিপাঁতি করে খুঁজল, আবার ভাবখানা দেখাতে হচ্ছে কিছুই যেন খুঁজছে না। যাক, সন্ধান হোলো না ঘড়ির।

মুশকিল হোলো পার্স নিয়ে। সেটাও পাওয়া গেল না। টাকাকড়ি কি ছিল সঠিক মনে পড়ল না, তবে ছ' সাত শ'য়ের কম হবে না। এক 'ব্যাক্লাভা'তেই ত চারশ' বাইশ পেমেণ্ট পেয়েছে। তা ছাড়া আরো ছুটো উইনে। কাল দিন ভালো গেছে মাঠে।

টাকার ক্ষতি গায়ে না মাখা অনেক দিন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ঘড়িরও। বহুবার এর আগে ট্রেনে ট্রামে পার্স ঘড়ি খোয়া গেছে। গিয়েছে—আবার হবে। আপাতত কেউ না টের পেলেই হোলো। কিন্তু—

কিন্তু আইডেন্টিটি কার্ডও যে ঐ পার্সে। ওটা খোয়া গেলে আবার সেই সাহেবকর্তার কাছে ছুটতে হবে আপিসে, হারানোর কি সাফাই দেবে সেখানে? একটু ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোলো অনিমেষ। বেশিক্ষণ নয়। ছ'টার শো-তে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওয়াল্‌ট ডিস্‌নির ছবি দেখতে বেরিয়ে গেল।

শনিবার রাত্রের বাড়াবাড়ির পর আজ নিরম্বু চলবে কিছুক্ষণ—একথা অনিমেষের স্ত্রী জানেন, তাছাড়া ছেলেমেয়ে সাথে—ঐ এক জায়গায় একটুও অসাবধান নয় অনিমেষ। তিনি বিশেষ ভাবিত হলেন না।

ছবি দেখে রাত সাড়ে আটটায় কলরব করতে করতে ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরল অনিমেষ।

ছেলেমেয়েরা কত গল্প শুনেছে বাবার কাছে এয়ার রেড ডিউটির। কিভাবে সমস্ত রাত তৈরি হয়ে বসে থাকতে হয়। বোমা যদি আপিস বিলডিংয়ে পড়ে তবে প্রথমেই ন শেলটার মানে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে বালির বস্তা ঢাকা সব সুড়ঙ্গ পথে। তারপর বোমারুরা চলে গেলে ফায়ার ফাইটিং, ফার্স্ট এইড, এই সবের ব্যবস্থা। কিভাবে স্টিরাপ পাম্প ব্যবহার করতে হয়—কিভাবে ছোটখাটো ব্যাণ্ডেজ করতে হয়—এই সব গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েরা বাপকে মস্ত একটা হিরো ঠাউরে নেয়। যদিও এতাবৎ একদিনও অনিমেষের বিলডিংয়ে বোমা পড়ে নি, এবং আজও স্টিরাপ পাম্প, ফার্স্ট এইড বাক্স—সব অব্যবহৃতই আছে, তবুও ছেলেদের মনে হয় তাদের বাবা রোজই ডিউটিতে বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে অসীম বীরত্বের সাথে কর্তব্য করে আসছেন, এবং এই সব বীরত্বের পুরস্কার একদিন পাবেনই পাবেন।

সকাল থেকে বাড়ি না আসার সময় পর্যন্ত সময়টা কিভাবে পরের দলকে ডিউটি বুঝিয়ে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে আসতে হয়েছে সেই কথা বোঝাতে বোঝাতে বাড়ি পৌঁছে যায় ওরা।

বড় ছেলে তখনো বাপের হাত ধরে আছে। অনিমেষ তাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছে,—ছুটির দিন বলেই ত দুপুরেও থাকে। আরেক দল পরের রাতের ডিউটি দিতে এসে পৌঁছে গেলে তাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি। খোলা দিনে ত সমস্ত দিন আপিসে লোকই থাকে—শুধু রাতটুকু ওয়ার ডিউটি। কিন্তু ছুটির দিনে—যেমন আজকে—দিনের বেলাও রেহাই নেই—

অনিমেষের স্ত্রী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ঝটকায় ছেলের হাত ছাড়িয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন বাপের কাছ থেকে। যাবার সময় যে চাউনিতে চেয়ে গেলেন তাতে রাগ বিদ্রূপ ঘৃণা তিনই মেশানো।

অনিমেষ পিতৃত্বের অভিমান ফলিয়ে বেশ একটা কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ তার চোখ পড়ল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। সেখানে তার পার্স, ঘড়ি, এক থাক খোলা নোট, আইডেন্টিটি কার্ড সাজানো রয়েছে।

স্ট্যাচু বনে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই তখন। স্ত্রীর গলার শেষ শেল বর্ষিত হোলো,—সরলাবালা দাসী, বড়বাজার ২১২৩, ফোন করতে বলে গেছে, সব জিনিস পাওয়া গেছে কিনা জানাতে—

বদ্‌রুল

বদ্‌রুলের নাম এখন বদিবাবু। সে নিজে বদলায় নি, দেশ ভাগ হবার পর আপনা থেকেই নাম পাল্টে গেছে। তার শুধু বদলেছে পোশাক-আসাক। নীল লুঙ্গি, গোলাপী গেঞ্জি, গলায় তক্তি; কুচকুচে কালো বাবরি, সরু লম্বা গোঁফের দুদিক ঝোলা, কবে উধাও হয়ে গেছে। এখন পরছে ঢিলে পাজামা, সাদা হাওয়াই শার্ট। ছোট করে ছাঁটা চুল কিন্তু আশ্চর্য, দাড়ি কামানো সরু গোঁফের জায়গায় এখন মুখভরা জঙ্গুলে দাড়িগোঁফ।

দিনকাল বদলে গেছে। বদ্‌রুলের ভাগ্যদেবতাও ওর ওপর একটার পর একটা বদলের পালা চালিয়ে গেছেন। প্রথমে ছিল পকেটমার পটলডাঙার আস্তানায়, তার পর হোলো গুণ্ডার সর্দার রাজাবাজারে, এখন হয়েছে বাড়িওয়ালা বণ্ডেলে।

একফালি জলাজমির ওপর মাটির আর খাপ্‌রার দোতলা বাড়ি—রেললাইন ঘেঁষে। আশেপাশে সবই জলা ছিল এখন কারখানায় ভরে উঠেছে। কিন্তু কোনো মালিকই বদিবাবুর ডেরায় হামলা করতে সাহস করে নি। গুণ্ডামি কবে ছেড়ে দিয়েছে বদ্‌রুল, কিন্তু হ্যাঁ, নামডাক আছে এখনো। এখনো তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ, আর আজও, তেমন তেমন যদি দরকার হয়, সে নিজে আসরে নামলে অগুনতি দুর্ধর্ষ চ্যালাচামুণ্ডা জুটে যাবে তার। তার সাবেক কালের শাগরেদরাই এখনো কলকাতার নানা অঞ্চলে সর্দার।

দিন চলে খুপ্‌রি ভাড়া দিয়ে। কিন্তু হুঁশিয়ার বদ্‌রুল তার ফেলে আসা জীবনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চায়। তার থাকবার মধ্যে আছে এক ছেলে মানারুল, আর সে আমলের অতি বিশ্বস্ত চ্যালা লট্‌কা। লট্‌কার নাম নটবর, রেশমের দড়ির ফাঁস দিয়ে লোক খুন করতে ওস্তাদ ছিল সে। লট্‌কাও বদলেছে। তার

গানের গলা ছিল ভাল। গলায় কণ্ঠি, ফোঁটা তিলক এঁকে গেরুয়া আলখাল্লা পরে সে মাধুকরীতে বেরোয়। দিনমানে রোজগার কম করে না, টাকার অঙ্ক আট-দশ গড়ে।

ভাড়াটেদের মধ্যে হরকিসিমের চিড়িয়া। খবরের কাগজে কাজ করে হরিলাল, দিনভর ঘুমোয়, রাতে ছাপাখানায় যায়। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার আছে বনমালী, আটটা বাজলেই কোট-পাৎলুন এঁটে গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা দাওয়াখানায় গিয়ে বসে, ফেরে ছুটো-আড়াইটেয়। বাস্। তারও রোজগার মাস গেলে শ'খানেক হয়। কোলেবাজারের ঝাঁকামুটেদের সর্দার ভিখন, ন রুপেয়া সীটরেণ্ট দেয়, সীট মানে নিজের পয়সায় কেনা দড়ির খাটিয়া একটা, দিনের বেলা খাড়া করে ওঠানো থাকে ছ্যালের গায়ে, রাতে বাসার সামনে রাস্তায় সেটা পেতে ঘুম লাগায় ভিখন।

এই ক'জনই স্থায়ী বাসিন্দা। আজ আছে কাল নেই এমন অনেক জনা রাত কাটাতে আসে ঐ বাসায়। তাদের কাছ থেকেও খুচরো আদায় মন্দ হয় না বদরুলের।

নাঃ, মন্দ নেই বদ্‌রুল। খালি ভাবে মানারুলটাকে মানুষ করা যায় কি করে। বাজে লাইনে দিতে মন সরে না, বনমালী ডাক্তারের কাছে এ বি সি ডি শিখে ছেলেটা আংরেজীতে লায়েক হয়ে উঠেছে। এখুনি শিস্ দেয়, বোল রাধা বোল তান ছাড়ে, বদরুলের এসব ভালো লাগে না। জোয়ান হলে ছেলে ঘরে বসে খাবে ভাবতেও পারে না সে, অথচ কোন লাইনে যে দেবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এক একবার ভাবে, ছেলেটা বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে না ত। তার পর ভাবে, নাঃ, বদরু সর্দারের রক্ত আছে ওর গায়ে, তাকদ খাটিয়ে খাবে, বাড়ুক আর একটু।

খুন জখম চুরি—এই ছিল পেশা—কিন্তু সে ত শুধু রুজি-রোজগারের ধান্দা। তাই বলে ছোট কখনো হয়নি নিজের ইমানের কাছে। যে তাকে বিশ্বাস করেছে, সে কখনো ঠকে নি। কতো সপাই, কতো ইনাম, কতো প্রলোভন, জীবনে এসেছে ও গেছে—

টলাতে পারে নি বদ্‌রুলকে। খাঁটি মরদের বাচ্চা সে, আজও মাথা উঁচু আছে নিজের জগতে।

ওপরটপ্‌কা চটকে মানারুলের মন ভোলে দেখে তবুও মাঝে মাঝে ঘাব্‌ড়ায় বদ্‌রুল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে শুরু করলে হয়ত সেরে যাবে, কিন্তু কোন খাটুনির কাজে লাগাবে ওকে। ভিখনের দলে ভিড়িয়ে ঝাঁকা মুটে করে দেবে? না, আস্‌গরকে ডেকে মৌলালিতে সাবেক পৈতৃক পেশায় লাগাবে? স্থির করে উঠ্‌তে পারে না। বাপের কলিজা বোধ হয় পায় নি ছেলেটা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বদ্‌রুল।

সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ, যখন বাড়িতে কেউ নেই, সিরাজ এসে নীচতলার আঙিনায় ঢুকল। কি চেহারা হয়েছে সিরাজের! চুল উষ্কখুষ্ক, বাঁ গালের খানিকটা কেটে গেছে, কোমরের গ্যাঁজে ঢোকানো লিক্‌লিকে ছোরাটার রক্ত তখনো শুকোয় নি।

সিরাজ আস্‌গরের দলের ছোকরা খুনে। পাকা হাত। মানারুল একা বাড়িতে, সে সিরাজকে চেনে না।

—সর্দার—সর্দার কোথা? বলল সিরাজ।

মানারুল বলল,—বা'জান বাড়ি নেই।

—শিগ্‌গির শিগ্‌গির কোনো জায়গা দেখা। পুলিশ পেছনে। দু'টো সেপাই ঘায়েল করে পালিয়েছি, কিন্তু ওরা পেছন ছাড়ে নি। মৌলালি থেকে সি. আই. টি. রোড ধরে কংগ্রেস বাগিচা পেরিয়ে এই রাস্তা ধরেছি, কিন্তু নজর এড়াতে পারি নি। তুই বুঝি সর্দারের ছেলে? সর্দার আমাকে চেনে। শিগ্‌গির জায়গা দেখা।

মানারুল থতমত খায়। জায়গা কোথায়? সবই ত ঘর আর বারান্দা আর লাইনের ধারের ডোবা। পুলিশ এলে ত খোলা মেলা সবই দেখতে পাবে।

—ভাবছিস্ কি? ওঃ, মাথায় আসছে না বুঝি কিছু? আচ্ছা দাঁড়া। আমিই দেখছি।

সিরাজ এদিক ওদিক ঢুঁড়ে ভিখনের খাটিয়ার তলা থেকে পোড়া

মাটির হাঁড়ি বার করল একটা। মাথায় টুপির মত বসিয়ে দেখে নিল মাপে ঠিক আছে কি না।

দেখল যে ঠিকই আছে। বরং ঢলঢলে হচ্ছে একটু। তাতে আসে যায় না। মানারুলকে বলল—ত্যাখ্,—এই দুটো টাকা রাখ। পুলিশ চলে গেলে সিনেমা দেখিস্। আমি হাঁড়ি মাথায় ওই ডোবাতে গা ঢাকা দিচ্ছি। শয়তানগুলো গেলে সিটি দিস্। বুঝলি ?

বলে জবাবের অপেক্ষা না করে সিরাজ কেটে পড়ল।

বুক তুরু তুরু, গা ঘেমে উঠেছে মানারুলের। এ জীবনের সাথে একটুও পরিচয় নেই তার। দুটো একটাকার নোট হাতের মুঠোয় চেপে হতভম্ব হয়ে বসে রইল সে।

সত্যিই সত্যিই মিনিট বিশেকের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ল। পেছনে ছোটখাটো একটা ভিড়, তাদের কাউকেই মানারুল চেনে না। তাদের বাড়ির কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না পুলিশ। দু'জন সিপাই সমেত একজন দারোগা ঘরে ঢুকে বলল, তুই কেরে ?

—মানু।

—মানুটা আবার কে হলি বটে। এ বাড়ির মালিক ত বদি বাবু, সে তোর কে হয় ?

—বাবা।

—আচ্ছা মানুবাবু—একটা গুণ্ডা ক্লাশের লোককে এদিকে আসতে দেখেছ ? ছোকরা মতো, লুঙি পরা, কোমরে গামছা বাঁধা। মুখ কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে ?

—না।

—সে কি বাপধন, এই ত এখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ দেখছি। বল কোথায় লুকিয়েছে খুনেটা—

—আমি জানি না।

—আলবাৎ জানিস হারামির বাচ্ছা—না বললে তোর জান ধড় আলাদা করে দেব মেরে—

—গালমন্দ করবে না সাহেব। আমি বদরু সর্দারের ছেলে।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠল,—জবান সামাল দারোগা সাব্, বদ্‌রু শুনলে এ দুনিয়ায় আর বেশিদিন দারোগাগিরি করতে হবে না।

বুড়ো কনেস্টবল ছিল একজন। সেও বলল,—ঠিক বাত আছে। বদিয়া উম্‌দা আদ্‌মি, ইমানদার আদ্‌মি। উন্‌কা নাম মাৎ লেনা দারোগা সাব্।

—আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই ছোঁড়া, তুই না হয় খুব পীর প্যাগম্বরের ছেলে, মানলাম, কিন্তু এখন বলত খুনেটা কোথায় লুকোল ? সেটা দুশ্‌মনি করে পালাচ্ছে, আর তুই এত বড় লোকের ছেলে হয়ে জেনে শুনেও বলবি না ?

আমতা আমতা করে মানারুল। দারোগা বোঝে ছেলেটা জানে। অন্য কায়দা ধরে এবার।

—তুই ত বেশ চালাক চতুর আছিস রে ছোঁড়া। কি খেতে ইচ্ছে করে তোর ? চপ্ কাট্‌লেট ? চল বাবা চল, পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি তোকে।

মানারুল ঘাড় নেড়ে বলে তার খাওয়ার শখ নেই।

—তবে কিসের শখ আছে বল ? ভালো জামা ও সিনেমা দেখা ? সব পাবি, সব পাবি, বলে ফেল সন্ধানটা।

চট্ করে টাকার কথা মনে হয় মানারুলের। টাকা দিয়ে ত সব কেনা যায়। ও ত হাতে নগদ কিছু পায়ই না কোন দিন। তার ওপর জলজ্যান্ত দু দুখানা একটাকার নোট ওর জিম্মায়।

কিন্তু খুলে বলতে পারে না কথাটা।

বলে বুড়ো কনেস্টবল।

—দশটো রূপেয়া ইনাম দে দেও সাব, লেড়কা কবুল কর সেক্‌তে।

—আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। দশটা টাকাই দেব তোকে। এই নে, এই নে—

বলে একখানা দশটাকার নোট পকেট থেকে বার করে দেয় মানারুলকে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে আর সবায়ের চোখের আড়ালে অন্দর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা উঠোন, তার পর ডোবা তার পর রেল লাইন। আশেপাশে কচু ঘেঁচুর জঙ্গল।

দশটাকায় মানারুলের মন টলেছে। সে শুধু তাকায় ডোবায় ভাসা কালো হাঁড়িটার দিকে। আর কিছু বলে দিতে হয় না দারোগাবাবুকে।

বদ্‌রুলের ফিরতে সেদিন রাত হোলো। দোতলায় নিজের খুপ্‌রিতে ঢুকতে গিয়ে দেখে দোর খোলা, ঘর অন্ধকার। ডাকল—মানু, মানারুল—

ভারি গলার আওয়াজ এল ভেতর থেকে।

—মানারুল নেই। আমি আছি সর্দার। আমি আস্‌গর।

—কে, আস্‌গর—কি বেটা, কি মনে করে রে—

—আলো জ্বেলো না সর্দার। আমি শাস্তি নিতে এসেছি।

—কিসের শাস্তি রে বেটা।

আস্‌গর অন্ধকারে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বদিবাবুর কানে কানে কথা কয়।

—ইয়া আল্লা, বলে বদ্‌রুল ধপ্‌ করে বসে পড়ে খাটে।

—এই নাও ছোরা, সর্দার। এইতেই মানারুলকে খতম করেছি আমি। আমি জানি তুমি থাকলেও তাই করতে। বদ্‌রু সর্দারের নাম না হলে মাটি হয়ে যেত পাড়ায় বে-পাড়ায়। কিন্তু, কিন্তু—আমাকেও তুমি খতম করো সর্দার।

সেই অন্ধকার কুঠরিতে চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল বদ্‌রুলের, মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরোল না।

এমনি করে একটির পর একটি ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। রাত যখন নিশুতি, তল্লাট থমথমে হয়ে এসেছে, বদ্‌রুলের কান্না থামা গলার আওয়াজ শোনা গেল,

—লাশ নিয়ে যা আসগর। ভাগাড়ে ফেলিস্ নি, গোর দিস্।

ছুটি

জুনের মাঝামাঝি ছুটি হয়ে যাবার পরেই হাফ্‌ইয়ার্লি রিপোর্ট এলো। কেনির নম্বরের বহর দেখে বাড়িসুদ্ধ সবাই থ'।

কেনি বলল, থাকৃত আমার নিজের ছো ট একটা ঘোড়া, তাহলে দেখিয়ে দিতুম নম্বর পাওয়া কাকে বলে।

রব ম্যাক্‌ল'লীন রেগেমেগে ছেলের দিকে তাকালেন। একটু ধন্দ ধরে থেকে, বললেন, বাপুহে, বলতে পারো পরীক্ষার কোনো বিষয়ে গোল্লা পাওয়া যায় কি করে? অঙ্কে চল্লিশ, ইতিহাসে সতেরো, বুঝি। কিন্তু জিরো। এ বকাঝকার কথা নয়, জিজ্ঞেস করি মাথায় পোরা কি আছে তোমার?

বড় ভাই হাওয়ার্ড ফোড়ন কাটে—বল্. বল্, খুলেই বলনা জিরো পাওয়ার মন্তরটা—

মা ধমক দিয়ে বলেন—হাওয়ার্ড! নিজের কাজ করো,—খাবার খেয়ে উঠে যাও।

পাৎলা সোনালি চুলওয়ালা মাথা, খাবার প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে। কেনির মনে হয় গালদুটো পুড়ে যাচ্ছে।

ম্যাক্‌ল'লীন এক চুমুকে কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে ঠেলে দেন টেবিলের মাঝখানে। বলেন—গোটা ছুটিটা দিন এক ঘণ্টা করে পড়বার বই নিয়ে বসবে, বুঝেছো?

কেনির সর্বাঙ্গ বেদনায় যেন কুঁচকে উঠলো, জোর ঘা খেলে যেমন হয়। সবে রোদ্দুর-মাখা দিনগুলো শুরু হবে প্রচণ্ড শীতের পর, সমস্ত ছুটিটা ধরে কতোরকম কিছু করবার প্ল্যান, আর তার মধ্যে কিনা দিনে এক ঘণ্টা করে ইস্কুলের পড়া!

ভগবান কি নেই! গভীর হতাশা-মাখা চোখে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে কেনি। দেখা যায় সামনের আটহাজার ফুট উঁচু পাহাড়টা, সর্বাঙ্গে যার সার সার বর্শার মতো সোজা দেবদারু গাছ, ফিকে মেঘের পটে আঁকা। দেবদারুর কোয়ারি শেষ হয়েছে,

সেখান থেকে আগাগোড়া কচি নরম গাঢ় সবুজ রঙের গালচে বিছানো। সূর্য যেন গলানো আগুন ঢেলে প্রকৃতির রংবাহারকে আরো বাহারি করে তুলেছে।

প্লেটের আড়ালে পড়ো পড়ো চোখের জলে ফোঁটা সামলে নিয়ে কেনি বললো,—আজ সকালে যখন পাহাড়তলিতে ঘোড়ার তদারকে যাবে, তখন কি আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা ?

—সব কাজ ফেলে সকালে একঘণ্টা পড়াশুনো—বুঝলে ? তারপর অন্যকথা। এস হাওয়ার্ড।

নাল লাগানো বুটে খটাখট আওয়াজ তুলে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যান ম্যাক্‌ল'লীন। হাওয়ার্ড বাবার পেছু পেছু যায়, পাছে কেনির আরো কষ্ট হয়, তাই তার দিকে তাকায় না।

সেইদিনই রাত্তিরে খাবার টেবিলে কেনি বলে,

—হাওয়ার্ড যখন আট বচ্ছরের, তখনই ওর নিজের একটা বাচ্চা ঘোড়া ছিল। ওই সেটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বড়ো করেছে। আজকে হাওয়ার্ড এগারো হোলো. হাইবয় তিন। হাওয়ার্ড এখন রোজ ওর ওপর চড়ে বেড়ায়। আর আমি, আমার ন বচ্ছর বয়স হয়ে গেছে, এখন একটা বাচ্চা আমায় দিলেও আমি তিন বছরেরটি না হলে সেটাতে চড়তে পাবো না। তদ্দিনে আমি বারো হয়ে যাব।

নেল্‌, মানে মা, হেসে ফেললেন।

—হিসেবে এক ফোঁটা ভুল নেই, কে বলে কেনি অঙ্কে কাঁচা।

বাবা কিন্তু ভেড়েন না। মাথা নেড়ে বলেন,

—তা বললে কি হবে? হাওয়ার্ড স্কুলে কোনো বিষয়েই পঁচাত্তরের নিচে নম্বর পায় না, জানো ?

কেনি জবাব খুঁজে পায় না। কেন যে ওর পরীক্ষার ফল ভালো হয় না কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। বই নিয়ে ত ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়—লোকে বলে বেশি বেশি পড়লেই ফল ভালো হবে।

ওর হয় না। সবাই বলে ওর বুদ্ধি খুব। তবে এত পড়েও ও অনেক শিখতে পারে না কেন? ওর অনেক সময় মনে হয়েছে, ও যে ফাঁক পেলেই জানালা দিয়ে আকাশ, পাহাড়, গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবতে থাকে কী যে সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে বাইরেটা জুড়ে—; এই সব ভাবনায় ডুবে থাকতে থাকতেই ঘণ্টা পড়ে যায়, পড়বার সময়ও ফুরিয়ে যায়।

যদি ওর এক্কেবারে নিজের একটা বাচ্চা ঘোড়া থাকতো!

সেই রাত্তিরে ছেলেরা শুতে গেলে সেলাইয়ের উপছেপড়া ডালি হাতে নেল এসে স্বামীর সামনে বসলো। রোজকার মতো রব নিজের ডেস্কে বসে হিসেবপত্রের কাজে মগ্ন, চোখের কোল ঘেঁষে একটু অন্যমনস্কতার রেখা, মুখে চিন্তার ছাপ।

নেলের মনে হোলো রবের সাথে কোথায় যেন কেনির মিল আছে। কিছু একটা মাথায় ঢুকলে সেই দিকেই মন পড়ে থাকে, আর সব ছেড়ে সেইটেই যেন তার চাই-ই চাই। ওয়েস্ট পয়েণ্টের ফৌজী স্কুলের নামকরা ঘোড়সওয়ার রব—আর্মির কাজই ছেড়ে দিল ঘোড়া পালবার জন্যে। যা চেয়েছিল, সবই সে পেয়েছে আজ।

গভীর নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে ছুঁচ থেকে সুতো ছিঁড়ে গেল। নেল ভাবছিল—সত্যিই ত। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া কি সোজা কথা। হাজারখানেক বিঘের এই খামার, শতাবধি ঘোড়া। সব খরচা মিটিয়ে লাভের অঙ্কে দাঁড় করানো,—গত বারো বছর ধরে সেই চেষ্টাই চলছে। লোকে বলেছে, অন্যের জমিতে জানোয়ার না চরালে খামারে লাভ নেই। বলেছে, যে সব খামারিরা জোচ্চোর, তারাই আজ বড়লোক। লোকে বলেছে—

হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বিদ্রোহিনীর ভঙ্গিতে ঘাড় খাড়া করলো নেল। সে জানে যতো বাধাবিঘ্নই আসুক তার বিরুদ্ধে লড়ে যাবে রব। কেনির মতো, বোধহয় তার নিজের মতনও। মনে পড়ল সব, প্রথম এ বাড়িতে আসার কথা। পাইপে করে বাড়িতে জল

আনাবার সুবিধে নেই। রোজকার রোজ হাজারো রকম খুঁটিনাটি, বড়ো ছোটো অসুবিধে, প্রতিবন্ধক। বিপদের আশঙ্কাও কম ছিলো না। কিন্তু মন প্রাণ শরীর দিয়ে সব তার বিরুদ্ধে লড়তে কি ভালোই লাগতো! এখনো লাগে, এখনো—

সুতোর গুলি একপাটি মোজার সুখতলার মধ্যে গুঁজে রাখলো নেল। কেনির মোজা। সাইজ দেখে ধক্ করে উঠলো বুকটা। কতো বড়ো হয়ে উঠলো ছেলেরা।

মনে পড়লো কেনির আবদার। বাচ্চা ঘোড়া। নেলের সেই ছোট্ট কেনি।

খানিকক্ষণ পরে বললো নেল,

—রব, দাওনা একটা বাচ্চা কেনিকে—

—এখনো পাবার যোগ্যতা হয়নি ওর।

ছোট্ট উত্তর। কাটাছাঁটা। কাগজপত্তর ঠেলে সরিয়ে রেখে, পাইপ বের করলো রব।

গোছগাছ করে সেলাইয়ের সরঞ্জাম বন্ধ করে নেল বলল,

—নিজের জন্যে একটা বাচ্চা ঘোড়া ওর চাই-ই। হাওয়ার্ড যখন হাইবয় দিয়েছিলে, সেই সময় থেকে ওর আর অন্য আকাঙ্ক্ষা নেই।

—যার যা কাজ, তা করবার জন্যে ছেলেকে ঘুষ দেওয়া আমি ভাবতে পারিনে।

—একে কি ঘুষ দেওয়া বলে?

—তবে কি বলে?

নেল ভাবনায় পড়লো। বললো,

—আমার কি মনে হয় জানো? কেনি কিচ্ছু করে উঠতে পারছে না, অথচ বয়স বাড়ছে। পরীক্ষার নম্বর খারাপ, শুধু সেটাই কোনো কথা নয়। কেন যে কোন কিছুই ঠিক্ ঠিক্ করে উঠতে পারবে না, সর্বদা মনমরা হয়ে থাকবে—

—আমার মনে হয় কেনিটা একটা গাধা।

—আদপেই না। ভেবে দেখো, নিজের যদি একটা বাচ্চা ঘোড়া পায়, তার তদ্বির খিদ্‌মৎ করে শেখায়, চড়ে,—

—কিন্তু বাচ্চা ঘোড়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে বাগ মানানো মোটেই সহজ কাজ নয়। কেনির মতো আনমনা ছেলের হাতে দিয়ে ভালো একটা বাচ্চা আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনে। দিনের বেলাই ও বসে বসে স্বপ্ন দেখে। কোনো কাজে একাগ্র মন হতে পারে না।

—কিন্তু একান্ত নিজের করে একটা বাচ্চা পেলে ও যে তাকে ভালোবাসবে রব! সেই ভালোবাসাই হবে ওর জিয়ন কাঠি— দেখে নিও তুমি।

—হ্যাঁ, যদি সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে। কিন্তু এযে মস্তবড়ো "যদি"!

পরদিন হাজারির টেবিলে কেনিকে বাবা বললেন,

—খাওয়া শেষ হলে পড়তে বসবে। একঘণ্টা পড়বার পর আস্তাবলে চলে এসো, সেখানে আমি থাকব। একুশ নম্বর ঘেরাতে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, সেইখানে মা আর বাচ্চাগুলোকে দেখতে যাব আমি। তুমি আমার সাথে যাবে।

হাওয়ার্ড চেঁচিয়ে উঠলো—আমিও যাবো বাবা—

রব ভ্রূকুটি করে হাওয়ার্ডের দিকে চাইলেন। বললেন,

—কালকে পায়ে নোংরা সুদ্ধ হাইবয়কে আস্তাবলে তুলেছিলে তুমি।

—আমি ত ওকে ডলাই মলাই করে তারপর—

—হ্যাঁ, খালি হাঁটু পর্যন্ত।

—ও যে পা ছোঁড়ে—

—কিন্তু সে দোষ কার? বলে দিচ্ছি, পা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত তুমি আর ওর পিঠে চড়বে না।

দুই ভাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। কেনির চোখে লড়াই জেতার চাউনি। হাওয়ার্ড-এর চোখে নৈরাশ্য।

ম্যাক্‌ললীন দরজা পর্যন্ত গিয়ে, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,

—কেনি, সাতদিন পর তোমায় একটা বাচ্চা দেব। এর ভেতরেই তুমি পছন্দ করে রাখো, কোনটা নেবে।

বন্দুকের গুলির মতো ছট্‌কে উঠলো কেনি। বাবার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে বললো,—

—সবে হওয়া বাচ্চা, না বছরখানেকের—?

ম্যাক্‌ললীন চম্‌কে উঠলেন, কিন্তু নেল আড়ালে হাসি চাপলো। এক বছর বয়েসের বাচ্চা পেলে হাওয়ার্ডের সাথে সমান সমান হবে কেনি। বল্‌লো,

—তোমার বাবার দেবার ইচ্ছে এক বছরের বাচ্চা। লক্ষ্মী ছেলে, এইবার যাও, পড়তে বোসো গে।

খামারে যাবার পথে কেনির মনে হোলো আজ তাকে আর পায় কে? গর্বে আনন্দে ঘাড় খাড়া করে চলেছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় মাপেও বোধহয় ইঞ্চিখানেক বেড়ে গেছে লম্বায়। নিজেকেই তার আজ আর একজন কেউ বলে মনে হচ্ছিল। গ্যাস্ আর টিম্ মার্ফি, দু'জন খামারু,—তারা ভাবছিল কেনি কোন বাচ্চাটাকে পছন্দ করে।

আন্দাজের অনিশ্চয়তায় পড়ে থাকতে হাওয়ার্ড রাজী নয়। সে বললো,

—কাকে পছন্দ করবি রে কেনি? আমি বলি কি, ডো-বয়কে নিয়ে নে, আমার হাইবয়ের যমজ বলে মনে হবে। অন্তত নামে। কি বলিস্?

দু'ভাই গিয়ে ঘোড়ার খোঁয়াড়ের ফটকে কাঠের রেলিংয়ে বসল।

হাওয়ার্ডের কথায় বিরক্ত হল কেনি। জীবনেও হাইবয়ের সাথে দৌড়ে পেরে উঠবে না ডো-বয়।

হাওয়ার্ড বলল তা হলে স্যাসিকে নে। ইণ্ডিয়ান ইন্‌কের মতো কুচকুচে কালো, আমার হাইবয়ের মতোই। আর দৌড়োবেও খুব জোর—

কেনি বলল,—বাবা বলেছেন ল্যাসি পনের হাতের চেয়ে বেশি বাড়বেই না কোনো দিন।

নেলি দেখল কেনির চাল-চলনে পরিবর্তন এসেছে। আশায় নেলির বুক ভরে উঠলো। ঠিক সময়টিতে বই নিয়ে বসে কেনি, আর পড়াশুনাও করে খুব মন দিয়ে। দিনের বেলা জেগে জেগে যে কেনি স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেত, সে আজ চটপটে কাজের লোক হয়ে উঠেছে। উদাহরণ মালা থেকে ঝরঝরে হরফে অঙ্ক টুকছে। ছোট হাজরির আগে পর্যন্ত একটানা কেনির ইতিহাসের বই থেকে রিডিং পড়বার আওয়াজ কানে আসে।

রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে মাকে চুমো খেতে যায় কেনি। এমন ডাকাতের মতো জাপটে ধরে গিয়ে। দু'হাতে মাকে তফাতে ধরে রেখে স্বস্তির হাসি হাসে মার চোখে চেয়ে, তারপর ধুপ করে গিয়ে বিছানায় পড়ে। দিনের পর দিন ঘোড়া আর বাচ্চাগুলোর তদ্বির তদারকে দিন কাটে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোঁয়াড়ের পাঁচিলে বসে থাকে মাতব্বরের মতো, আর খড় চিবোয়।

দিন সাতেক পর মন স্থির করে বাবাকে বলে,

—আমি রকেটের ঐ বছরখানেকের মেয়ে বাচ্চাটাকে নেব বাবা। ঐ যেটার ঘিয়ে রঙের কেশর আর ল্যাজ—

আশ্চর্য হন রব। বলেন, আরে ঐ যেটা সেদিন কাঁটাতারে আটকে গেছল? ওটার ত নামই রাখা হয়নি—

কেনি হঠাৎ চুপসে যায়। কিন্তু গোঁ ছাড়ে না। বলে,

—হ্যাঁ।

—পছন্দটা সুবিধের হোলো না কেনি।

—কেন, ও তো খুব জোরে ছোটে, বাবা। ওর মা রকেট, সে ত সত্যিই রকেট—

—স্পিড্ খুব, মানি। কিন্তু আমার আস্তাবলে ওদের চেয়ে খারাপ জাতের ঘোড়া আর নেই। মেয়েগুলো ডাইনি, আর মদ্দাগুলো বোম্বেটে। কেউ পোষ মানবার নয়।

—আমি পোষ মানাবো।

রব ঘোঁৎ করে নিশ্বাস ফেলেন। বললেন,

—আমি ত নয়ই, আর কেউও ওদের লাইনের কারুকে বাগ মানাতে পারেনি। এখনো মত পাল্টাতে পারো কেনি। তুমি ত এখন ঘোড়া চাও যে তোমার বন্ধু হবে?

—হ্যাঁ।

—ঐ ছুঁড়ি ঘোড়াটাকে কখনো দোস্তিতে রাজি করাতে পারবে না। আমি ওদের হাড়হদ্দ চিনি। আর ওটা তো ডাইনি মায়ের ডাইনি মেয়ে। সমস্ত গা ক্ষতবিক্ষত—কাঁটা তারের বেড়া বাধা কিছু মানে না।

—জানি আমি। বলে বটে কেনি, কিন্তু গলার আওয়াজ ওর অস্পষ্ট হয়ে আসে।

হাওয়ার্ড ফোড়ন কাটে—ফ্যাল্ না বদলে। রোখ চেপে যায় কেনির। বলে,—না।

রবের মুখভাব থম্‌থমে হয়ে যায়। নিরাশ হন তিনি। কিন্তু ছেলের পছন্দমাফিক বাচ্চা দেবেন বলেছেন, কথা দিয়ে কথা ফেরাতে পারেন না।

—ওই শয়তানীকে ঢিট করতে অনেক বেগ পেতে হবে কেনির—একলা পারবেও না। সাহায্য দরকার হবে। মনশ্চক্ষে দেখেন রব, যে দিনের পর দিন, যে মাসের পর মাস, শুধু পণ্ডশ্রমে ব্যয় হচ্ছে।

নেলের বুকও নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। কেনি যেন আবার বিগড়ে গেছে। যা করা উচিত, তা না করে, যা করতে নেই তাই করতে যাচ্ছে। কিন্তু গোঁ আছে বটে ছেলের। দাঁত ঠোঁট চেপে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন অদৃশ্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করছে।

ওর পছন্দের ঘোড়া যে আর সবার চাইতে অনেক আলাদা, সে শুধু কেনিই জানে। ওকে দেখবামাত্র কেনির মন টেনেছে—খুশিতে গান বেজে উঠেছে বুকে। চোখ দিয়ে খুশি উপছে পড়বে ভয়ে ও মুখ নিচু করে থাকে।

ও জানতো। কেনি জানতো, ঐটেকেই ও পছন্দ করবে। কেনি যে ওর প্রেমে পড়েছে। গুস্তাভ, সেই সুইড্ খামারু,—বিরাট পালোয়ান একটা।—তার সঙ্গে ঠিক একটি বছর আগে পাহাড়ে ঝোপঝাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল কেনি। সেই সময় দেখতে পেয়েছিল রকেট একটা বুনো পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ—যা রকেটের কুষ্ঠিতে লেখে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে শান্ত চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু খুব সন্তর্পণে।

গুস্তাভ বলল,—আলবৎ ওর বাচ্চা হয়েছে, নইলে অতো চুপচাপ থাকবার মতো নিরীহ জীব ও নয়।

তুজনায় পা টিপে টিপে ওর দিকে এগোয়। নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস ছেড়ে রকেট চেঁচিয়ে ওঠে চিঁহি চিঁহি করে, তারপর মাথা ঝাঁকা দিয়ে দেয় ছুট।

ওরা বুনো গলির কাছ বরাবর পৌঁছে দেখে কি, গোলাপি গা, ঘিয়ে রঙের বাদাম, ছোট্টমোট্ট এক বাচ্চা, নরম নরম চারটে পায়ে ভর দিয়ে যেন দাঁড়াতেই পারছে না, নড়বড় করছে। ওরা কাছে যেতেই কিচ্কিচ্ করে ওঠে রকেটের খুকি, তারপর যে দিকে ওর মা গিয়েছিল সেই দিকে পানে ছুট দেয় কচি পায়ে, এঁকে বেঁকে।

গুস্তাভ বলে,—বাহবা, জিতা রহো ফ্লিকা।

—ফ্লিকা কেন? ফ্লিকা মানে কি?

ছোট্ট মেয়েদের ফ্লিকা বলে সুইডিসে।

সেই রাত্রে খাবার টেবিলে বাবাকে বলে কেনি,

—বাবা, তুমি বলেছিলে ওর নাম হয়নি। আমি ওর নাম দিলুম ছুট্টি—মানে ফ্লিকা।

এখন প্রথম কাজ হোলো ওর মুখে রাশ পরানো। সমবয়সী এক পাল বাচ্চাদের সাথে ডানপিটেমি করে বেড়ায় ছুট্টি। যতো খানা, খন্দ, ঝোপঝাড়ের দিকেই ওর টান।

বুড়ো রবরয় পুরোনো ঘোড়া, খুব ঠাণ্ডা মেজাজের। তার পিঠে

চড়ে ফ্লিকার মনিব বাহাত্বর—মানে কেনি—ছুট্টিকে শায়েস্তা করবার তালে ঘোরে। একবার ধরতে পারলে হয়।

যখন তাড়া খেয়ে বাচ্চার পাল পাহাড়মুখো ছোটে, ফ্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ হয়ে। কেনির মনে হয়, পা ওর মাটিতে ঠেকছেই না—যেন উড়ছে, আর সবায়ের থেকে অন্তত হাত ত্বয়েক আগে। বাতাসে ঘাড়ের কেশর আর ল্যাজ ত্বটি চামরের মতো ত্বলছে। ঠিক যেখানে পা ফেলতে চায় সেইখানে সামনের পা ত্বটি গিয়ে পড়ছে, আর ফ্লিকা বয়ে চলেছে বাইচের নৌকোর মতো। কেনির মনে হয়, ও যেন হাওয়াপরী!

রবরয়ের পিঠে বসে স্থিরভাবে দেখে কেনি। পুরো গ্যালপে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাবা ব্রজনাদে গর্জে ওঠেন।

—হাঁ করে দেখছিস কি? ছোট্ ওর পেছনে—ওদের দৌড়ের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে না?

যেন স্বপ্ন ভেঙে কেনি জেগে ওঠে। তারপর রবরয়কে ছোটায় বাচ্চাদের পেছনে। দলস্থদ্ধ ফিরিয়ে নিয়ে আসে। খোঁয়াড়ের বন্ধ দরওয়াজা খুলে যার যে ডেরা সেখানে ওদের ঢুকোতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। ফ্লিকা যেখানে বাচ্চাদের প্রথম দেগে দেওয়া হয়, সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। গুস্তাভ আরগুলোকে তাড়িয়ে দেয় গেটের বাইরে। খালি একা ফ্লিকা আটকে থাকে টিকে দেবার চৌহদ্দির মধ্যে।

ফ্লিকা কি খোঁয়াড়ে আটকে থাকার পাত্রী! লম্বা থামওয়ালা ঘেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মতলব, লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাবার—কিন্তু সাত ফুট দেওয়াল। সামনের পা ত্বটি দেওয়ালের মাথার আংটায় আটকে যায়, প্রায় ঝুলে থাকে ফ্লিকা; আর আছাড়ি পিছাড়ি করে। ভয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে কেনি ভাবে, গেল বুঝি কচি কচি পা ত্বটো মট্‌কে। ওপারের পা ত্বটো হঠাৎ এক ঝটকায় খুলে যায় ফ্লিকা চিৎপটাঙ হয়ে পড়ে। চেঁচিয়ে, গড়াগড়ি খেয়ে আবার চাঙা হয়ে ওঠে ফ্লিকা।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয় কেনির। রব অত্যন্ত বিরক্ত হন। বুঝে উঠতে পারে না কেনি কি করবে সে।

ফ্লিকা আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঠের বেড়ার ওপর। ওপরের সার থেকে একখানা কাঠ ভেঙে পড়ে, তারপর আর একখানা। একটু ফাঁক হতেই কুকুর যেমন দেয়ালের ফাটল দিয়ে গলে যায় তেমনি কায়দায় মাথা আর সামনের পা দু'খানা গলিয়ে দেয়, ঝটাপটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, কিন্তু কাঁটা তারে আর ভাঙা বেড়ায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় ফ্লিকার। তারপর—দে ছুট, দে ছুট—

গুস্তাভ ফিরে আসছিল ফটক বন্ধ করতে, তার পাশ দিয়ে ফ্লিকা হুশ করে বেরিয়ে যায়, যেন উড়ন্ত পাখিটির মতো, না না, তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো।

গুস্তাভ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, মুখ দিয়ে খালি বের হয়—বাপস্—শাবাশ!

রব কেনিকে আবার ভেবে দেখতে বলেন।

—এই শেষবার কেনি। এখনো মন ঠিক করে বলো যে কোন বাচ্চা তোমার চাই। মানে এমন একটা পছন্দ করো যার পিঠে চড়তে পারবে। ঝাড়ে বংশে রকেটের গুষ্টি আমি বেচে দিতুম, কিন্তু ওরা সবাই দৌড়ে এত ওস্তাদ যে আমার মনে হয়েছিল হয়ত ওদের মধ্য থেকে ভালো রেসের ঘোড়া বেরোবে একটা। কিন্তু সে আশার ছাই। পোষ ওরা কেউই মানবে না—ফ্লিকা ত নয়ই।

—হুঁ, ফ্লিকা—কখ্‌নো না, যা জংলী,—

ভারিক্কি গলায় সায় দেয় হাওয়ার্ড।

কেনি যেন আপন মনে বলে,—

—হয়তো ওকে পোষ মানানো যায়, বাবা—

নেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাপছেলের কথাবার্তা শুনছিল। কেনির কাঁপা ঠোঁটে ওর চোখের চাউনি দেখে মনে হোলো ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—তোমার যা ইচ্ছে, কেনি,—বললেন রব।

—তুমি যদি ফ্লিকাকেই চাও, ওকেই পাবে। কিন্তু আমার মনে হয় ও মরে গেলেও পোষ মানবে না। দেখতে সুন্দর,—তেজীও, কিন্তু মাথা খারাপ। ও সত্যিই জংলী।

কেনি অসোয়াস্তি বোধ করে বাবার দিকে তাকাতে।

—কি ঠিক করলে? এটা জেনো, আজকের মতো দুষ্টুমি করলে রাখা চলবে না।

চোখ নামিয়ে কেনি বলে,—আমি ওকেই চাই।

সহিসরা ধরে পাকড়ে ফ্লিকাকে ফিরিয়ে আনলো এবারে। তাদের নসীব ভালো। ফ্লিকা তবুও একবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে দিলো লাফ পালাবার জন্যে, কিন্তু হুড়মুড় করে পড়ে গেল খোঁয়াড়ের ভেতর। এবার ধরাই পড়লো।

পালের অন্য বাচ্চাগুলোকে খেদিয়ে বার করে দেবার পর ফ্লিকা একাই রইলো খোঁয়াড়ে। বাইরে থেকে কেনি শুনতে লাগলো তার দাপাদাপির আওয়াজ, অসন্তোষের হ্রেষা, বৃথা পালানোর চেষ্টায় ধুপ্ করে পড়ে যাবার শব্দ। কেনি ঘামে নেয়ে উঠলো।

এইবারে ঘোড়াদের খেতে দেবার সময় হোলো। রব বললেন,

—জ্ঞানগম্যি ফিরুক ফ্লিকার, ঠাণ্ডা হোক। চলো আমরা ঘুরে আসি, এসে ওকে ধুয়ে মুছে খেতে দোব'খন।

কিন্তু ওঁরা সবাই যখন ফিরলেন, কোথায় ফ্লিকা? আস্তাবলে, আশেপাশে কোথাও তাকে দেখা গেল না। ঘোড়া বাঁধবার খুঁটি থেকে অনেক উঁচুতে একটা জানালা,—দেখা গেল তার পাল্লা দু'টো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

জানালার নিচেই কাঁটা তার ঘেরা দূর্বাশ্যামল চরবার মাঠ—তারের বেড়া ছ'ফুট উঁচু। আস্তাবলের গা ঘেঁষে বিচিলির ওয়াগন, তারই পেছনে পাওয়া গেল ফ্লিকাকে। কিন্তু ওঁদের দিকে চোখ পড়বামাত্র সে আবার পালালো, মাঠের পূব বরাবর দিলো ছুট।

—রকেটের স্বভাব পেয়ে থাকলে জংলিটা কাঁটাতার মানবে না,

ছিঁড়েছুঁড়ে বেরিয়ে যাবে—বললেন রব।

—আলবৎ যাবে, আমি বাজী রাখতে পারি,—বললো গাস—দৌড়ে ও হরিণকে হার মানায়।

রব বললেন, আজ পর্যন্ত কোনো ঘোড়া লাফিয়ে ও বেড়া ডিঙোতে পারে নি।

কেনি কথা বলছে না, কথা কওয়ার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে সে। তার ছোট্ট জীবনের বিপন্নতম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে, ফ্লিকা যতো বেড়ার কাছে এগুচ্ছে।

বেড়া কয়েক গজ দূরে থাকতেই থমকায় ফ্লিকা, আবার মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ মুখে ছোটে।

কেনি ফুঁপিয়ে ওঠে—বাবা, বাবা, ছাখো ওর বুদ্ধি। ঠিক ফিরেছে। নিছক জংলী নয় তাহলে। আনন্দে দু'চোখে জল ভরে ওঠে কেনির।

ফ্লিকা দক্ষিণ উত্তর, সব দিক যাচাই করে দেখে ফিরছে, আর হাওয়ার বেগে দৌড়চ্ছে। আস্তাবলের দিক্ বাগে আদপেই আসছে না। গতিবেগ একটুও না কমিয়ে পালানোর সব সম্ভাব্য ফাঁক খুঁজে খুঁজে ঘুরছে।

শেষবারের মতো নিরাশ হয়ে, ফ্লিকা দক্ষিণ-মুখ আবার ধরলো, যেদিকে আজন্ম কেটেছে। তারপর দিলো বিরাট এক লাফ।

রব, গুস্তাভ আর কেনি অজান্তে চোখ ঢাকলেন। কেনির বুক ভেঙে চাপা গোঙরানোর শব্দ বেরুলো।

বিশ গজ লম্বা কাঁটাতারের বেড়া প্রায় খুঁটি সমেত ধূলিসাৎ করে দিয়ে ফ্লিকা পেরিয়ে গেলো। চিৎ হয়ে পড়লো গিয়ে ওপরে, সাথে টেনে নিয়ে গেলো সর্বাঙ্গ ঘিরে কাঁটাতারের নাগপাশ, বেরিয়ে যাবার সমস্ত আশা হোলো সুদূর পরাহত।

রব দিব্যি গেলে উঠলেন,

—গোল্লায় যাক কাঁটা তার। পয়সা নেই, তাই ভদ্রগোছের বেড়া দিতে পারিনে—

সবার সাথে চললো কেনি, মাথা নিচু করে, যেখানটায় ফ্লিকা পড়ে আছে। ঘিরে দাঁড়ালেন সবাই বাচ্চাটাকে, আর সে পা ছুঁড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে এমন করতে লাগলো যার ফলে গায়ে তারের কাঁটা সব বিঁধে মাংস, চামড়া খুবলে খুবলে উঠিয়ে ফেলতে লাগল। অনেকক্ষণ যুঝবার পর অবশ হয়ে, অজ্ঞান হয়ে গেল ফ্লিকা, তার সোনালী মেশানো বাদামী রং রক্তারক্তি হয়ে গেল, আশে-পাশে জমিতে ছোটোখাটো গর্তগুলো রক্তে ভরে উঠল।

তার কাটবার ভারি কাঁচি গুস্তাভের পকেটেই থাকে। কাঁটা-তার কেটে-কুটে পরিষ্কার করতে লাগলো সে। মুক্ত হলে ফ্লিকাকে টেনে টুনে সবুজ নরম ঘাসে শুইয়ে দেওয়া হলে। গম, বিচিলি, এক টব জল এনে মুখের কাছে রাখা হোলো। গুস্তাভ-এর বেড়া মেরামত হয়ে গেল সবাই ফিরলেন।

রব বললেন,—সেরে উঠবে বলে মনে হয় না, এখন ভগবান ভরসা।

পরদিন ভোরে কেনি উঠলো পাঁচটায়, উঠে পড়তে বসলো। পড়া হয়ে যাবার পর চললো ফ্লিকার কাছে।

যে ভাবে পড়ে ছিল আগের সন্ধ্যেয়, সেই ভাবেই পড়ে আছে ফ্লিকা। আদৌ নড়েনি। ছোঁয়ও নি গম বিচিলি জল। যেখান-কার যা তেমনি পড়ে আছে।

কেনি এক বালতি তাজা জল এনে ওর মুখে ঢেলে দিলো। দিয়েই এক লাফে তফাতে এসে দাঁড়ালো। জ্ঞান হয়েছে ফ্লিকার, কোনো মতে অপটু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু টলছে।

কেনি আরো গজ কয়েক দূরে সরে গিয়ে দেখতে লাগলো কি করে ও। যখন কেনি ভোরের খাবার খেতে বাড়ি গেল, ফ্লিকাও যেন সংবিৎ ফিরে পেল। লম্বা চুমুকে অনেক জল খেলো, গম বিচিলি চিবোতে লাগলো।

এর পর আরোগ্যের পালা শুরু হোলো ফ্লিকার। খাবার খেতে

লাগলো, জল খেতে লাগলো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক পা দু'পা চলতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কাপাসগাছ তলায় পা ছড়িয়ে। আঘাতের জায়গাগুলো শুকিয়ে এলো, সারতেও শুরু করলো।

কেনিরও ঘর-বাড়ি ঐ আস্তাবলে। একটু ক্ষণের জন্যে সে ফ্লিকার সাথ ছাড়ে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়। কাপাস গাছতলায় সাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো কখনো দু'হাত মেলে আদরের সুরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যায়, কিন্তু ফ্লিকা কাছে ঘেঁষতে দেয় না। দক্ষিণ দিকে বেড়ার কাছে গিয়ে এমনভাবে দিগন্তে চেয়ে থাকে, দূরের পাহাড় বরাবর, কেনির চোখে জল আসে। সে বোঝে ফ্লিকা বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু পারে না।

রব কিন্তু তবুও বলেন, যে ফ্লিকা আর সেরে উঠবে না। জিন কষতে ভয় পান, ফ্লিকা এত দুর্বল।

সেদিন কেনি বাড়ি থেকে সবে বেরুচ্ছে, গুস্তাভ এসে খবর দিল ফ্লিকার আবার অসুখ হয়েছে।

দৌড় দিলো কেনি আস্তাবল মুখো। সাথ নিল পাছু পাছু হাওয়ার্ড। পেছনের ডান পায়ের হাঁটু, যে জায়গাটা খুব ফুলে ছিলো, দগদগে ঘায়ে ফেটে পড়েছে। ফ্লিকা মড়ার মত নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। চোখ খোলা, কিন্তু ভুরুর কাঁপন নেই। স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি।

হাওয়ার্ড বোধ হয় ভালো ভেবেই বললো—ছ্যাখ্ তো, তখন যদি ডো-বয়কে নিতিস্—

চেঁচিয়ে উঠলো কেনি—চলে যাও এখান থেকে।

হাওয়ার্ড তবুও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কেনি মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ফ্লিকার মাথা কোলের ওপর তুলে নিয়েছে। ফ্লিকা জ্ঞান হারায় নি। শরীরে ঈষৎ স্পন্দন দেখা দিল। কিন্তু মাথা কোলে রাখতে আপত্তি করলো না, ভয়ও পেলো না। কেনির দু'গাল বেয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা ফ্লিকার মাথায় টপ

টপ করে পড়তে লাগল, আর সে মাথায় হাত বুলিয়ে, কানের কাছে মুখ নামিয়ে কত আদরের কথা বলতে লাগল।

পা টিপে টিপে হাওয়ার্ড বাড়ির দিকে সরে পড়লো।

—ঘোড়াদের কাটা ঘা বিষিয়ে উঠলে কি করতে হয়, মা?

—ঠিক মানুষের বেলায় যা করতে হয়। গরম জলে তুলো ভিজিয়ে সেঁক, মানে কম্‌প্রেস আর কি। তুই ভাবিস নি কেন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ঘা ভেতর থেকে পরিষ্কার না হলে খোসা পড়তে দেওয়া হবে না, বুঁজে যেতেও না। একটা পুল্‌টিশ বানিয়ে দিচ্ছি আমি, চল তোর সাথে গিয়ে ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন যখন তোর বাচ্চা আমার কাছে গেলে তড়বড় করে পালাবে না, এখন আমরা ওর অসুখের সময় যা করবার সব করতে পারব।

রব বললেন—হুঁ। আসলে চোখ রাখতে হবে, খাওয়া বন্ধ না না করে। দুর্বল হয়ে পড়লে মুশকিল—তবে এ যাত্রা আর যে খাড়া হয়ে উঠবে, মনে হয় না। ওকে দেখতে, কি ওর কথা ভাবতেও আমার ভালো লাগছে না।

মা আর কেনি ফ্লিকার শুশ্রূষায় নিমগ্ন হল। হাঁটু ঘিরে মস্ত পুল্‌টিশ জড়ানো হল। অনেক পুঁজরক্ত পুল্‌টিশ বদলানোর সময় উঠে আসে। ধীরে ধীরে ফ্লিকা যেন ভালো বোধ করে, একটু একটু করে দাঁড়াতে পারে আবার। সে এখন কেনির জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে, কেনি এসে পোষা কুকুরের মতো সাথে সাথে ঘোরে তিন পায়ে অসমতালে ধুপধুপ করে। হাঁটুতে মস্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পেছনের পা'টা উঁচিয়ে রাখে, কমিক লাগে দেখতে।

বাবাকে কেনি বলে,—বাবা, ফ্লিকা এখন আমায় খুব ভালোবাসে। বন্ধুর মতো সাথে সাথে ঘোরে।

আজ বাবা নতুন চোখে তাকান কেনির দিকে। বলেন,

—আমি খুউব খুশি হয়েছি, কেন্। ঘোড়ার মতো বন্ধু মানুষের নেই।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষা ঢালোয়া সবুজ ঘাসের মাঠের নিচে ঠাণ্ডা পাথর নুড়ির ওপর দিয়ে তর্তর্ করে পাহাড়ী ঝরণা বয়ে চলেছে। মাঠ সেখানে নামতে নামতে জলের সাথে প্রায় মিশে গেছে। সেই থেকে ফ্লিকাকে নিয়ে গিয়ে বসে কেনি। কুট্কুট্ করে নরম ঘাস খায় ফ্লিকা, স্রোতের জলে মুখ ডুবিয়ে ঢক্ঢক্ করে জল খায়।

বরাদ্দ যউয়ের বালতি সকাল সন্ধে হাতে করে নিয়ে আসা কেনির দৈনন্দিন কাজ। তার আসার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে ফ্লিকা, কান খাড়া করে, উৎসুক চোখে তাকিয়ে। একদিন বিকেলে যখন বালতি হাতে কেনি একটু দূরে যেন কি কারণে থেমে গিয়েছিলো, পরক্ষণেই হাসিতে তার মুখ ভরে উঠেছিলো। সে শুনেছে ফ্লিকার অধৈর্য হ্রেষা, তার দেরি হচ্ছে দেখে ফ্লিকা যেন তাকে বকছে—কেন থামছো? শিগগির এসো! দেখছো না আমি খিদেয় মরছি!

বালতিতে মুখ চুবিয়ে যখন খাচ্ছে ফ্লিকা, কেনি তার কানে কানে বলে—তুই এবারে চট্ করে সেরে উঠবি রে ছুট্টি, এত জোর হবে তোর গায়ে, যে আমি তোর পিঠে চড়লে টেরও পাবি না। তারপর, আমরা দু'জনে ছুট্ লাগাবো ঝড়ের থেকে জোরে—

কেনির ঐটুকু জীবনে সব চেয়ে সুখের দিন ঐ কটি।

কিন্তু কিসে যে কি হয় কে জানে। হঠাৎ একদিন একটি করে ফ্লিকার গায়ের কাটা ঘাগুলো আবার ফুলে উঠতে লাগলো। তারপর, মুখ হয়ে সেগুলো ফাটতে শুরু করলো। মায়ের সাথে কেনি পুল্টিশ বানায়, ঘায়ে লাগায়। ছুট্টি তিন পায়ে ভর দিয়ে ক'দিন ছুটোছুটি করলো বটে, কিন্তু দিনের পর দিন শুকিয়ে উঠতে লাগলো, শেষে আর যেন চেনা যায় না, প্রায় কঙ্কালসার হয়ে গেল। পাঁজরার হাড়গুলো জিরজির করতে লাগলো, অমন চকচকে সোনালী গায়ের রং ফাটা-ফাটা ভুষোমাখা হয়ে উঠলো। মনে হতে

লাগলো যেন বাচ্চা একটা ঘোড়ার কঙ্কালের ওপর পুরোনো রদ্দি চামড়া খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আঁটসাঁট করে।

গুস্তাভ বলে—জ্বর। জ্বরে পুড়ছে বাচ্চার সর্বাঙ্গ। যদি জ্বর বন্ধ হবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে ভালো হয়ে উঠতে সময় লাগবে না।

রব জানালায় দাঁড়িয়ে একদিন প্রাতঃসূর্যের আলোতে দেখলেন ওই কঙ্কালসর্বস্ব জীর্ণ-শীর্ণ বাচ্চাকে, কষ্টে তিন পায়ে লাফিয়ে চলাফেরা করছে। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন,

—ব্যাস্। আর ওকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা বৃথা।

কেনিকে বুঝতে হোলো শেষ পর্যন্ত, যে ফ্লিকা এই ক'দিন ধরে আদৌ ভালো হয়ে উঠছিলো না, বরং ঠিক তার উল্টো। সে ধীরে ধীরে মরবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু মন মানে না। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো বলে,

—কিন্তু ঘাস, যউ তো খাচ্ছে—

কেনির জন্য দুঃখ হয় সবায়ের। নেল বন্ধ করে দিলো ঘায়ের পুল্টিশ বানানো, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ছেলেকে বললো,

—কেন্, আর কি হবে চেষ্টা করে? বুঝতে পাচ্ছিস না ও মরে যাচ্ছে!

ঘাড় নেড়ে কেনি জানায়, সে বুঝতে পেরেছে।

কেনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। হাওয়ার্ড বলে,

—কেনি কিছু খাচ্ছে না দাচ্ছে না। কেন? ওকে কি খাবার সময় খেতে হবে না, মা?

কিন্তু নেল শুধু বললো,—তুমি চুপ করো হাওয়ার্ড।

রুগ্ন কি আহত জন্তু-জানোয়ারকে গুলি করে মেরে ফেলার রেওয়াজ পশ্চিমি পশুপালকদের মধ্যে প্রচলিত। নিষ্ঠুরতা নেই এ প্রথায়, অবোলা জীবকে অকথ্য কষ্ট ভোগ থেকে সত্বর নিষ্কৃতি দেবার স্পৃহা এর মূলে। তাই রব যখন ফ্লিকার শেষকৃত্যের হুকুম দিলেন বন্দুকের গুলিতে, হুকুমের সুরে কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটলো না, যেন একটা বাঁধা গৎ আউড়ে গেলেন।

—মার্লিন রাইফেলটা রাখো গুস্তাভ। যখন কেনি ওদিকে নেই দেখবে, বেচারা ফ্লিকার সব যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেবে।

রাইফেল নিয়ে গাস্ বললো,—আচ্ছা।

তা'বলে এমন নয় যে কেনি কিছু বোঝেনি। বন্দুকের দাঁড়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বন্দুকগুলো সার সার দাঁড় করানো থাকে। দাঁড়টা রাখা ঠিক খাবার ঘরের দরজা ঘেঁষে। দিনে তিনবার খাবার ঘরে ঢুকতে কেনি সে পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখেছে যেখানকার যেটা সে বন্দুক ঠিক জায়গাতেই আছে। সেই রাত্রে দেখলো, দাঁড়ের একটি ঘর খালি। মার্লিন রাইফেল জায়গাতেই নেই।

দেখেই কেনি দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো মাথার ভেতর। দাঁড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চাইলো—না, নিশ্চয় মার্লিন ঠিক জায়গাটিতেই আছে, তারি দেখবার ভুল! গুণতে লাগলো একটার পর একটা—মাথা কেমন ঘুলিয়ে এলো, সব আবছা হয়ে এলো—

পড়ে যেত কেনি, কিন্তু কার শক্ত হাতের বাঁধনে আটকা পড়ে বেঁচে গেল সে যাত্রা। শুনলো, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বাবা বলছেন,—

—আমি কি বুঝতে পারিনি কেন, তোমার কতো লাগছে! কিন্তু কেন, এ জীবনে মিষ্টি দিকও যেমন আছে তেমনি কড়া দিকও আছে। দুটোকেই মেনে নিতে হয়। আমারও কি হয় না, কেন—

নিজের মুঠোয় বাবার হাত শক্ত করে এঁটে ধরে প্রকৃতিস্থ চেষ্টা করে কেনি। তারপর বাবার দিকে মুখ তুলে তাকায়। রব স্নেহের হাসি হাসেন মুখ নীচু করে ওর দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেন, পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। কেনিও অতি কষ্টে ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি টেনে আনে।

—ভালো লাগছে এখন?

—হ্যাঁ, বাবা।

—চলো, খেতে যাই।

অল্প ছুটো আজকে খেলোও কেনি। কিন্তু নেল ওর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শঙ্কিত হোলো। ভয় পেলো ওর ঘাড়ের পাশের মোটা শিরাটার দপ্‌দপানি দেখে।

সাপারের পর ফ্লিকার যউএর বালতি হাতে রওনা হোলো কেনি। অবুঝ অসুস্থ বাচ্চার মতো ফ্লিকাকে আদর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দু'চার দানা মুখে নেওয়াতে পারলো। ঝিমোনো মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, কিন্তু কেনি যখন আদর করে পিঠে ঘাড়ে চাপড় দিচ্ছে, তখন তার বুকে মাথা গুঁজছে। যেন আরাম পাচ্ছে তাতে। কেনি তখন টের পেল ফ্লিকার গা পুড়ে যাচ্ছে। অতো রোগা, আর অতো অসুস্থ—ও যে কি করে এখনো বেঁচে আছে, ভেবে অবাক হয় কেনি।

গুস্তাভ এই সময়ে মার্লিন হাতে এদিক পানে আসছে। কেনিকে দেখে সে ঘুরে জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালো, যেন কাঠবেড়ালি শিকার করতে বেরিয়েছে। কেনি দৌড়ে গিয়ে ধরলো তাকে।

—কখন তোমার কাজ শেষ করবে, গাস্?

—এখুনি ত করতাম, অন্ধকার হবার আগেই।

—আজকের রাতটা থাক্ না, গাস্,—মিনতি করে কেনি। কাল সকালে যা করবার কোরো। শুধু আজকের রাতটা—

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু, কেন একাজ যে আমায় করতেই হবে, কত্তার হুকুম—

—জানি। আর কিছু বলবো না আমি।

বাড়ির সবাই শুতে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে কেনি উঠে বাইরে যাবার জামাকাপড় পরে নিলো। ফট্‌ফটে চাঁদের আলোয় দিক ভরে গেছে। ছোট্ট ঝরণা নদীর পার দিয়ে দৌড়তে কেনি মৃদু সুরে ডাকতে লাগলো—ফ্লিকা—ফ্লিকা,—ছুট্টি—

শেষমেষ ওকে পাওয়া গেল যেখানে খানিকটা পাহাড় নদীর জলের মধ্যে নেমে এসেছে, সেইখানে। মাথা নদীর ধারে, কিন্তু শরীরটা সব জলের মধ্যে—নদীর খরস্রোত তাকে নদীর মধ্যে যেন

টেনে নিয়ে যাচ্ছে, শক্তি নেই বাধা দেবার। একটু একটু করে মাথাও জলের মধ্যে নেমে গেল, শুধু নাকের ডগাটুকু বেরিয়ে রইলো, চারটে পা জলের তোড়ে এদিক ওদিক করছে—কোন আশ্রয় পাচ্ছে না ভর দেবার।

ধার থেকেই শরীরটা যতদূর সম্ভব জলের মধ্যে নামিয়ে দিল কেনি। দু'হাত দিয়ে মাথাটা জলের ওপর জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কম ভারী ত নয়। আর জলের মধ্যে ভারী জিনিস যত শিগগির ডুবতে থাকে এমন আর কোথাও নয়। নিঃশব্দ কান্নায় কেনি ফোঁপাতে লাগলো, তার গায়ে জোর কোথায় যে একটা ঘোড়াকে, হোক না সে বাচ্চা, টেনে জল থেকে তুলতে পারে।

হঠাৎ নজর পড়লো জলের তলায়, লাগসই বড়ো একটা পাথর। তাতে পা বাঁধিয়ে বেশ খানিকটা জোর খাটাতে পারে। তাই করলো সে। প্রাণপণে পায়ে ভর দিয়ে ফ্লিকার মাথাটা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে জল থেকে যথাসম্ভব তুলে ধরলো নিজের হাঁটুর ওপর, আর তেমনিভাবে ঠায় বসে রইলো।

মনে মনে স্বস্তিও পাচ্ছিলো কেনি এই ভেবে, যে যাক্, এ ভালোই হোলো। ওকে ত গুলি করে মারবার হুকুম হয়ে গেছে। নিজে থেকে ঠাণ্ডা জলে ডুবে, ভরা চাঁদের আলোয় যদি প্রাণ ওর বেরিয়ে যায়, সে হাজার গুণে ভালো। এইবারে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফ্লিকাকে দেখতে লাগলো, শেষ দেখা।। কিন্তু ওকি! ফ্লিকা তো বেঁচেই রয়েছে!

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো কেনি।

রাত্তির যেন আর শেষ হয় না, তাও পোহালো এক সময়ে।

বিশাল আকাশের কোন্ এক কোণায় চাঁদ অস্ত গেলো।

ঝরণাধারার খরস্রোত সারারাত্র যেমন ওদের দুটির গা ধুইয়ে বয়েছিলো, তেমনি বইতে লাগলো।

ফ্লিকার শরীরের উত্তাপ, গায়ের জ্বর, কখন ছেড়ে গেছে। তাজা জলে ধুয়ে গায়ের সমস্ত ঘা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

গুস্তাভ সকালে রাইফেল নিয়ে যখন পৌঁছল, ওরা দুজনই তখন নিঃসাড়, নিস্পন্দ। কেনির শরীরের অর্ধেক জলে, ফ্লিকার সর্বাঙ্গ, শুধু মাথাটা কেনির কোলে জাপ্টানো।

গাস্ ফ্লিকার মাথা ধরে টেনে হিঁচড়ে পথের ঘাসের ওপর তুললো। কেনির জ্ঞান নাই, শরীর কাঠ। কোলপাঁজা করে তাকে তুলে বাড়ি নিয়ে এলো গুস্তাভ।

পথে একটু একটু সংবিৎ ফিরতেই অস্পষ্ট গলায় কেনি বললো,

—গাস্, ওকে মেরো না গাস—

—আমি কি মালিক, কেনি? তুমি ত জানো,—

—কিন্তু জ্বর ছেড়ে গেছে যে—

একটু ধৈর্য ধরো, কেন্—

বাড়িতে পৌঁছতে কেনির অবস্থা দেখে রব তক্ষনি পাশের শহরে ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। শীতে কেনির দাঁত ঠক্ঠক্ করছে, নেল তিন-চারখানা গরম কম্বলে মুড়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

ডাক্তার থার্মোমিটার ঝাড়ছে যখন, কেনি বাবার দিকে কাতর চোখে তাকালো।—ওর জ্বর ছেড়ে গেছে বাবা, ও এবারে ভালো হয়ে উঠবে। যেই না চাঁদ ডুবে গেলো ওর জ্বরও ছেড়ে গেল।

—আচ্ছা, তুই ভাবিস্ না কেন্। গাস্ ওর তদ্বির করবে, সকাল বিকেল খাবার নিয়ে যাবে, যতদিন না—

—যদ্দিন না আমি ওসব করতে পারি আবার।

ডাক্তার থার্মোমিটার ওর মুখে দিয়ে হাঁ-মুখ বন্ধ করতে বললেন।

সমস্ত দিন গুস্তাভ গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কাজ নিয়ে রইলো। ফ্লিকার দুর্ভাবনা মন থেকে যাচ্ছে না। ফিরে যায় নি, যেখানে ও পড়ে আছে। কোনো নতুন হুকুম পায়নি, যদি ও বেঁচেই থেকে থাকে, তবে গুলি করে মারবার হুকুমই বহাল আছে। কিন্তু কেনির অসুখ, হয়তো রব ফ্লিকার কথা এখনকার মতো ভুলে গেছেন।

সহিসদের ডেরায় রাত্রের খাওয়া শেষ হলে গাস্ আর টিম নদীর

শ্বাসে গেলো। বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দু'জনেই দেখতে যাচ্ছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে। কথা কেউ বলছে না।

ওদের দেখে ফ্লিকা ঘাড় খাড়া করে মাথা উঁচু করলো।

—ভগবান আছেন! ও বেঁচে আছে রে—

ফ্লিকা মাথা তুলছে আর নামাচ্ছে। পা নাড়িয়ে দম নেবার চেষ্টা করছে। যেন উঠতে চায়।

গাস বললো—শাবাশ! এখনো শরীরে বেশ জোর আছে।

ঠোঁটের পাইপ এ কোণ থেকে ও কোণে নাড়া-চাড়া করতে করতে গুস্তাভ ভাবতে লাগলো, এমন কি করা। হুকুম যাই থাক, বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে। কেনি নিজের প্রাণ দিতে গিয়েছিলো ওর জন্যে, কেনির ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে হবে।

—শোন টিম্। কম্বল কেটে দোলনা মতো বানিয়ে নিয়ে চল। ওকে কোনো মতে খাড়া করে তুলতে হবেই।

ধবধবে জ্যোৎস্নার আলোয় ওদের কাজ করতে সুবিধেই হোলো। শাবল এনে বাচ্চার দু'পাশে গভীর গর্ত করলো, পুঁতে দিলো মজবুত শালের খুঁটি। কম্বলের হ্যামকে দড়া বেঁধে খুঁটির গায়ে পুলির সঙ্গে জুড়ে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে বাচ্ছাকে তুলতে লাগলো।

একটুও ঘাবড়ালো না ফ্লিকা এত কাণ্ডকারখানা দেখে। লক্ষ্মীটির মতো কম্বলের দোলায় গা এলিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলো পুলির টানে। পা মাটিতে ঠেকতেই জলের বালতিতে মুখ ঢুকিয়ে ঢকঢক করে জল খেতে লাগলো।

অনেক দিন ভোগান্তি গেলো কেনির, ডাক্তার প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ফ্লিকা কিন্তু দিনের দিন ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। গাস ওয়াকিবহাল রাখে নেলকে, নেল গিয়ে কেনিকে বলে।

—আজ সবটা যউ খেয়েছে।

—পেটের তলা থেকে কম্বলের দোলনা আজ খোলা হোলো।

—পেছনের ডান পাটায় আবার জোর পাচ্ছে, ভর দিতে পারছে একটু একটু করে। এমনি দৈনন্দিন।

রাত্তিরে খেতে বসে টিম্ বলে,

—যা বলিস ভেলকি বাজির মতো ঠেকছে সব।

—ভেলকি না ছাই। ঐ ঝরণার ঠাণ্ডা জলের ধারা জ্বরটর সব ধুয়ে নিয়ে গেছে। আর, সব্বার ওপর কেনির—ভাবছিস বুঝি জন্তু-জানোয়ারেরা কিছু বোঝে না?—কেনির দিনরাত কানের কাছে মন্তর জপা ভালো হয়ে ওঠ ফ্লিকা, ভয় কিরে, আমি তোর সাথে আছি। আমি কি তোকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি রে। তুই আর আমি, আমি আর তুই—সবসময়ে একসাথে—

টিম্ গাসের কথা শুনে কি বুঝলো সেই জানে, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, জবাব দিলো না। সেও যেন ঐ ধারাতেই ভাবতে লাগলো মনে হোলো। নির্জন রাতের নিঃশব্দতার মধ্যে এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে শজারু যাবার খস্‌খস্ শব্দ হতে লাগলো, পাহাড়ের গায়ে দেবদারু সারের মাথা দুলিয়ে হাওয়া স্বন্‌স্বন্ করে বয়ে গেল।

গাস পাইপ ঠুকে, খালি করে, আবার তামাক ভরতে বসল।

টিম্ আপন মনে বললো,—আলবৎ। ঠিক তাই। কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর সেই দিনটি এলো।

হাসিমুখে রব কেনির খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বললেন,

—ঐ শোনো। তোমার ছুট্টি তোমায় ডাকছে।

কান খাড়া করে কেনি শুনতে লাগলো। ফ্লিকার চিঁ হি হি। যেন সত্যিই তাকে ডাকছে।

—জলে জঙ্গলে আর ঘোরে না ফ্লিকা। যতক্ষণ বেঁধে রাখা যায় ততক্ষণ আস্তাবলে থাকে। বাকি সময়টা এই ঘরের চার পাশে ঘুর-ঘুর করে আর ডেকে ডেকে সারা হয়।

—সত্যিই আমাকে ডাকে বাবা?

জবাব দেন না রব। গরম কাপড়চোপড় দিয়ে মুড়ে ওকে কোলে নিয়ে বাইরে আসেন।

ফ্লিকার দিকে তাকিয়ে দেখে কেনি। চোখের পলক পড়ে না। অলীক, স্বপ্নের মতো মনে হয় সব। তার ছোট্ট মনে বাইরের জগতের রূপ ছিলো, ধমক, শাসন, কর্তব্যের খাতিরে যত নিষ্ঠুরই হোক সেই কাজ করা। আর যাকে ভালোবাসা যায় তার জন্যে কাঁদা। আজ যেন সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। চারদিক এত সুন্দর, এত মধুময়। সমস্ত দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। আজ তাকে কোলে নিয়ে বাবার মুখ আনন্দে, গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাবার হাতে হাত রেখে সে সব বুঝতে পারছে। কিন্তু নতুন চেতনার কাছাকাছি যেন পৌঁছতে পারছে না।

কিন্তু তার ফ্লিকা,—তার ছুট্টি! একদম ভালো হয়ে গেছে সে মুখ ঘষছে তার গায়ে, নিজের জন বলে চিনতে পারছে—ঐ ত ডাকছে তাকে!

জীর্ণ, দুর্বল হাত দিয়ে ফ্লিকার মাথা ছোঁয় কেনি। অশক্ত আঙুল দিয়ে ওর কপালের ঝুঁটি সিজিল করে করে দেয়, যেমন অনেক আগে দিত।

রব আজ নতুন দৃষ্টিতে,—নতুন বিস্ময়, নতুন আনন্দ মেশানো চোখে দেখেন ওদের।

—এখনো খুব দুর্বল আছে, না বাবা? তবু তো চার পায়ে হাঁটছে!

—পুরোপুরি সেরে উঠবে শিগগিরই—একটুও ভেবো না কেন্।

হঠাৎ বাবার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—

—বাবা, পোষ মেনেছে ও। না আগের মতো জংলী—

—পোষ! বেরালছানাটির মতো পোষ মেনেছে।

কেনির আস্তানা বাবা ঝরণার ধারে করে দিয়েছেন—আলনা পালঙ—সব।

ছুট্টি আর কেনি, দু'জনাই খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছে।
